দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবাদাত

পৃথিবীর সকল মাখলুককে মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আর মানুষ ও জিন জাতিকে শুধু আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কুরআনে এসেছে, 'আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এই জন্য যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে'। (সূরা আয- যারিয়াত, আয়াত: ৫৬) ইবাদাতের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে শরিয়ত সমর্থিত যে কোনো উত্তম কাজই ইবাদাত।

ইবাদাত অর্থ আনুগত্য করা, বিনয় প্রকাশ করা, নমনীয় হওয়া, দাসত্ব করা। ইসলামি পরিভাষায় জীবনের সকল কাজ-কর্মে আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলাকে ইবাদাত বলে। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা ইবাদাতের পরিচয়, তাৎপর্য ও প্রকারভেদ সম্পর্কে জেনেছ। ইসলামের প্রধান কয়েকটি ইবাদাত সালাত (নামায), সাওম (রোযা) ও যাকাত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছো। এখানে আমরা ইসলামের মৌলিক ইবাদাতসমূহের মধ্যে সালাত (নামায), সাওম (রোযা), যাকাত ও হজ সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো।

সালাত (اَلصَّلٰوةُ)

প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির ইবাদাত অধ্যায়ে ইসলামের মৌলিক ইবাদাত সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছো। এখন নিশ্চয়ই বাস্তব জীবনে সেগুলো অনুশীলন ও চর্চা করো। ৮ম শ্রেণির এই অধ্যায় থেকে তুমি চারটি ইবাদাত সম্পর্কে আরো বিস্তারিত ধারণা অর্জন করবে। এভাবে এই অধ্যায়ের বিভিন্ন অংশে শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী ইবাদাতগুলো নিজে অনুশীলন ও চর্চা করার মাধ্যমে ইবাদাতের মূল শিক্ষা আত্মস্থ করতে পারবে।

এই অধ্যায়ের পাঠের আলোচনা শুরুর পূর্বেই একটু মনে করার চেষ্টা করো, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে ইবাদাত অধ্যায়ে তুমি কী কী পড়েছিলে বা শিখেছিলে? এই ব্যাপারে তোমার সহপাঠী বন্ধুদের সহায়তা নাও, প্রয়োজনে

শ্রেণি শিক্ষকের সহায়তা নাও। শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে এই অধ্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে। তাহলে চলো, আমরা এই ইবাদাত সংক্রান্ত আলোচনা শুরু করি।

প্রতিফলন ডায়েরি লিখন

'আমি সপ্তম শ্রেণিতে জেনে যেসব সালাত নিয়মিত চর্চা করি'

(প্রিয় শিক্ষার্থী, উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে নির্ধারিত ছকটি তুমি শ্রেণিতে পূরণ করবে। এক্ষেত্রে, তুমি তোমার সহপাঠী বা শিক্ষকের সহায়তা নিতে পারো। পূরণকৃত ছকটি মা-বাবা/অভিভাবকের মতামতসহ পরিবর্তী সেশনে জমা দিবে।)

ক্রমিক	সপ্তম শ্রেণিতে জেনে আমি যেসব সালাত নিয়মিত চর্চা করি	সালাতের রাকাআত সংখ্যা/ বিশেষ নিয়ম	অভিভাবকের মন্তব্য/স্বাক্ষর
১.	সালাতুল বিতর।	তিন রাকাআত, তৃতীয় রাকাআতে দোয়া কুনুত পড়তে হয়।	নিয়মিত পড়েছে।
২.			
৩.			
৪.			

ইমান গ্রহণের পর মুমিনের প্রথম পালনীয় ইবাদাত হচ্ছে সালাত। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মাঝে সালাত একমাত্র ফরয ইবাদাত যা আমরা প্রতিদিন আদায় করি। সালাত সর্বোত্তম ইবাদাত। বিচার দিবসে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম বান্দার সালাতের হিসাব নিবেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) নিয়মিত সালাত আদায়কারীর জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। ইচ্ছাকৃত সালাত পরিত্যাগকারী ফাসিক বা পাপাচারী হিসেবে পরিগণিত হবে। তাই আমরা নিয়মিত সালাত আদায় করবো। পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত ছাড়াও রাসুলুল্লাহ (সা.) দিনের বিভিন্ন সময়ে নফল সালাত আদায় করতেন। আমরা ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে ফরয সালাতসহ অন্যান্য সালাত আদায় করা শিখেছি। সেগুলো অনুশীলন করেছি। তারই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন নফল সালাত যেমন, সালাতুল আওয়াবিন, সালাতুত তাহাজ্জুদ ইত্যাদি আদায় করা শিখবো ও প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করবো।

নফল সালাত

নফল অর্থ অতিরিক্ত। ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদা সালাত ব্যতীত যত প্রকারের অতিরিক্ত সালাত আছে, সবই নফল সালাত। রাসুলুল্লাহ (সা.) কিছু সালাত মাঝে মাঝে আদায় করতেন আবার মাঝে মাঝে আদায় করা থেকে বিরত থাকতেন, যাতে উম্মতের ওপর তা ওয়াজিব না হয়ে যায়। এমন সালাত সুন্নাতে যায়েদা বা সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা নামে পরিচিত। এগুলো আদায়ের সময় নির্দিষ্ট। যেমন সালাতুল ইশরাক্ব, সালাতুল আওয়াবিন, সালাতুত তাহাজ্জুদ ইত্যাদি। পক্ষান্তরে রাসুলুল্লাহ (সা.) যে সালাত সর্বদা আদায় করেছেন ও সাহাবিদেরকে আদায় করতে তাগিদ দিয়েছেন তা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। যেমন, ফজরের ফরযের পূর্বে দুই রাকাআত, যোহরের ফরযের পূর্বের চার রাকাআত ও পরের দুই রাকাআত সালাত ইত্যাদি।

এছাড়া নিষিদ্ধ ও মাকরুহ ওয়াক্ত ব্যতীত অতিরিক্ত যে কোনো সালাতকে আমরা মুস্তাহাব সালাত বলি। সুন্নাতে যায়েদা ও মুস্তাহাব সালাত নফল সালাতের অন্তর্ভুক্ত। নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত যে কোনো সময় নফল সালাত আদায় করা যায়। নফল সালাত দুই বা চার রাকাআত করে আদায় করতে হয়। তবে দুই রাকাআত করে আদায় করা উত্তম। সুন্নাত সালাতের নিয়মে নফল সালাত আদায় করতে হয়।

প্রতিফলন ডায়েরি লিখন

সালাত সংক্রান্ত শিক্ষকের বর্ণিত ঘটনা বা গল্পের শিক্ষা আমার নিজের জীবনে যেভাবে প্রয়োগ করতে চাই।

পরিবারের সদস্য/ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পাশাপাশি নফল সালাত আদায় করার নিয়ম জেনে নিবো। .....

নফল সালাতের গুরুত্ব

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা হতে চায়, তার উচিত বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করা। সালাত রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সবচেয়ে প্রিয় ইবাদাত। তিনি বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করতেন। ফরয ও ওয়াজিব সালাত আদায় করলে অন্তরে যে নূর তৈরি হয়, নফলের মাধ্যমে তা বৃদ্ধি পায়। অন্তরের প্রশান্তি আসে। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلٰوةِ

অর্থ: 'নামাযেই আমার চোখের শীতলতা দান করা হয়েছে।' (নাসাঈ)

দলীয় আলোচনা

সালাতেই আমার চোখের শীতলতা দান করা হয়েছে

(উল্লিখিত হাদিসের মর্মবাণী শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক দলে/প্যানেলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করে উপস্থাপন করো।)

নফল সালাত আদায়কারী আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। আল্লাহ তা'আলার প্রতি চূড়ান্ত আনুগত্য ও বিনয় প্রকাশের সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে সিজদা করা। আর সালাত আদায়কারী সিজদারত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন, 'আপনি সিজদা করুন ও নিকটবর্তী হন'। (সূরা আল আলাক, আয়াত: ১৯) হাদিসে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'তোমার উচিত বেশি বেশি সিজদা করা (অর্থাৎ সালাত আদায় করা)। তুমি যখনই আল্লাহর জন্য একটি সিজদা করবে, তার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তোমার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন ও একটি গুনাহ মাফ করবেন।' (মুসলিম)

একদিন রাবিআহ ইবনু কাব আল আসলামি (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট জান্নাতে তাঁর সাহচর্যের জন্য আবেদন করেন। তখন তিনি তাকে বেশি বেশি সিজদা করার পরামর্শ দেন, যাতে তিনি জান্নাতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাহচর্য লাভে ধন্য হতে পারেন। (মুসলিম)

তাই আমরা ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদা সালাত আদায় করার পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য নিয়মিতভাবে বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করবো। যোহর সালাতের পর দুই রাকাআত নফল, আসর সালাতের পূর্বে চার রাকাআত, মাগরিবের সালাতের পর দুই রাকাআত, এশার সালাতের পূর্বে চার রাকাআত সালাত আদায়ের অভ্যাস করবো। আমরা ফরয সালাত আদায়ে অনেক সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল করে ফেলি। নফল সালাত ফরযের ঘাটতি পূরণ করে। ইবাদাতে ইখলাস বৃদ্ধি করে। আমরা নির্জনে নফল সালাত আদায়ের চেষ্টা করবো, যাতে আমাদের সালাত লৌকিকতামুক্ত থাকে।

বাড়ির কাজ

'এখন থেকে আমি ফরয সালাতের পাশাপাশি আর যেসব সালাত আদায় করতে পারবো'

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে নির্ধারিত ছকটি তুমি তোমার পরিবারের সদস্য/সহপাঠীর সহায়তায় পূরণ করো।)

সালাতুল আওয়াবিন (صَلٰوةُ الْأَوَّابِيْنَ)

আওয়াবিন অর্থ নেককার ও অধিক তাওবাকারী বান্দাগণ। সালাতুল আওয়াবিনের আভিধানিক অর্থ নেককার ও অধিক তাওবাকারী বান্দাগণের নামায। মাগরিবের সালাত আদায়ের পর এশার সালাতের পূর্বে যে সালাত

আদায় করা হয়, তাই সালাতুল আওয়াবিন। এ সালাত আদায় করা সুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদা। অর্থাৎ যে সুন্নাতের ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা না থাকলেও আদায় করলে সাওয়াব পাওয়া যায়।

সালাতুল আওয়াবিন আদায়ের নিয়ম ও ফযিলত

মাগরিবের ফরয ও সুন্নাত সালাত আদায়ের পর দুই রাকাআত করে সুন্নাত সালাত আদায়ের নিয়মে ছয় রাকাআত সালাত আদায় করতে হয়। রাসুল (সা.) এ সালাত আদায় করেছেন ও সাহাবিদেরকে আদায়ের উৎসাহ দিয়েছেন। সালাতুল আওয়াবিনের ফযিলত সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকাআত সালাত আদায় করে, মাঝখানে কোনো মন্দ কথা না বলে, তাহলে সে বারো বছরের নফল ইবাদাতের সমান সাওয়াব পাবে'। (তিরমিযি)

যেহেতু এ সালাত সুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদা, তাই ছয় রাকাআতের কম বা বেশি আদায় করা যায়। রাসুল (সা.) অনেক সময় মাগরিবের পর থেকে এশা পর্যন্ত সালাত আদায় করেছেন। হাদিসে বর্ণিত আছে, 'হযরত হুজায়ফা (রা.) নবি করিম (সা.)-এর সাথে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) মাগরিবের সালাত আদায় করে এশার সালাতের পূর্ব পর্যন্ত সালাত আদায় করলেন'। (সহিহ ইবনে খুজায়মা)

আমরা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের জন্য সালাতুল আওয়াবিন আদায়ের অভ্যাস করবো। প্রতিদিন আদায় করতে না পারলেও বিশেষ দিনগুলিতে যেমন জুমার রাত, রমযান মাস বা ছুটির দিনে আমরা সালাতুল আওয়াবিন আদায় করবো।

সালাতুত তাহাজ্জুদ (صَلٰوةُ التَّهَجُّدِ)

তাহাজ্জুদ আরবি শব্দ। এর অর্থ ঘুম থেকে জাগা, রাত জাগা, রাত জেগে ইবাদাত করা। আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের জন্য সালাতুল এশা আদায় করার পর শেষ রাতে যে সালাত আদায় করা হয়, তাই সালাতুত তাহাজ্জুদ। রাতের শেষভাগে বা দুই-তৃতীয়াংশে সালাতুত তাহাজ্জুদ আদায় করা উত্তম। রাসুল (সা.)-এর জন্য তাহাজ্জুদ সালাত আদায় আবশ্যক ছিল। কোনো কারণে রাতে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করতে না পারলে, পরের দিন যোহর সালাতের আগেই তা কাজা আদায় করে নিতেন। এমনকি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করার কারণে তাঁর পা ফুলে যেত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের প্রিয় নবিকে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করার জন্য তাগিদ দিয়ে কুরআন মাজিদে বলেন,

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۝

অর্থ: 'আর আপনি রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করুন। এটি আপনার জন্য অতিরিক্ত কর্তব্য।' (সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত : ৭৯)

উম্মতের জন্য সালাতুত তাহাজ্জুদ ফরয বা আবশ্যিক করা হয়নি। তবে তিনি সাহাবিদেরকে এ সালাত আদায়

করার জন্য বিশেষ তাগিদ দিয়েছেন। তাই সাহাবিগণ এ সালাত নিয়মিত আদায় করতেন। তাহাজ্জুদ সালাত সর্বোত্তম নফল সালাত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হলো তাহাজ্জুদ সালাত'। (মুসলিম)

সালাতুত তাহাজ্জুদ আদায়ের নিয়ম

সুন্নাত সালাতের নিয়মে দুই রাকাআত করে সালাতুত তাহাজ্জুদ আদায় করতে হয়। তাহাজ্জুদ সালাত সর্বনিম্ন দুই রাকাআত আদায় করা যায়। চার, আট বা বারো রাকাআত আদায় করা যায়। কেউ বেশি আদায় করতে চাইলে, তাও আদায় করতে পারবে। এশার সালাত আদায়ের পর থেকে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করা যায়।

তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করার পরে বিতর সালাত আদায় করতে হয়। যদি ঘুম থেকে জেগে তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ের অভ্যাস না থাকে, তাহলে এশার সালাতের পর বিতর সালাত আদায় করে নিতে হবে। বিতর সালাত আদায় করলেও ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করতে কোনো অসুবিধা নেই।

তাহাজ্জুদ সালাতের গুরুত্ব

আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের এক অনন্য গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম তাহাজ্জুদ সালাত। কারণ চারদিকে সবাই যখন আরামের ঘুমে মগ্ন, তখন নির্জনে কোনো বান্দা শুধু আল্লাহকে খুশি করার জন্য সালাতে দাঁড়ায়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি খুশি হন। তাহাজ্জুদ সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সাথে বান্দার গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়।

দিনে আমরা নানা কাজে ব্যস্ত থাকি। আমরা চাইলেও অনেক সময় আমাদের অন্তর আল্লাহ তা'আলার প্রতি একান্তভাবে ধাবিত করতে পারি না। তাই রাতের সালাত আমাদের অন্তরকে প্রশান্ত করে। আল্লাহ তা'আলার বিধিনিষেধ মানা সহজ হয়। আমাদের অন্তরের কুপ্রবৃত্তিও দমন হয়। ফলে তাহাজ্জুদ আদায়কারীর চারিত্রিক উন্নতি সাধিত হয়। অন্যায় কাজ থেকে আমরা সহজেই দূরে থাকতে পারি। আল্লাহ তা'আলা বলেন 'নিশ্চয়ই ইবাদাতের জন্য রাতে জাগ্রত হওয়া প্রবৃত্তি দমনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল'। (সূরা আল-মুযযাম্মিল, আয়াত: ৬)

আল্লাহ তা'আলা তাহাজ্জুদ সালাত আদায়কারীর দোয়া কবুল করেন ও গুনাহ মাফ করে দেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ তা'আলা প্রথম আকাশে অবতীর্ণ হন এবং বলেন, 'যে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দিব। যে আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করবে, আমি তাকে তা দান করবো। যে আমার কাছে মাফ চাইবে, আমি তাকে মাফ করে দিব''। (বুখারি ও মুসলিম)

আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা হওয়ার জন্য আমরা নিয়মিত তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করবো। তাহাজ্জুদ আদায় করে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি কয়েকবার দরুদ পাঠ করবো। তারপর আল্লাহ তা'আলার নিকট নিজের জন্য, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও সকল মানুষের জন্য দোয়া করবো।

তাহাজ্জুদ সালাত ছাড়াও আমরা যে কোনো সময় নফল সালাত আদায় করতে পারি। আল্লাহ তা'আলা সালাত সম্পর্কে বলেন 'তোমরা আমার কাছে ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো' (সূরা বাকারা, আয়াত:

১৫৩)। শুকরিয়া আদায় করতে, দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হতে, বিপদে-আপদে বা কোনো প্রয়োজনে আল্লাহ তা'আলার নিকটে সাহায্য চাওয়ার জন্য আমরা নফল সালাত আদায় করবো।

একক কাজ

অনুশীলন

(প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা শিক্ষকের আলোচনার মাধ্যমে যে যে সালাতের নিয়ম জেনেছো, সেই সালাতসমূহ শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক নির্ধারিত স্থানে অনুশীলন করো।)

পাঠ্যপুস্তকে নিম্নে উল্লিখিত সালাতসমূহ নির্ধারিত সময়ে আদায় করে, নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করি প্রিয় শিক্ষার্থী, তুমি নিম্নে উল্লিখিত ছক দুটি সঠিক তথ্য দিয়ে মা-বাবা/অভিভাবকের মতামতসহ এক সপ্তাহ পর জমা দিবে।

ক্রমিক	সালাতের নাম	আদায় করার নিয়ম
১.	সালাতুল আওয়াবিন।	মাগরিবের নামাযের ফরয ও সুন্নাতের পর ছয় রাকাআত সালাত।

বার/তারিখ	যে যে নফল সালাতের আদায় করেছি	যে স্থানে আদায় করেছি	যে সময় আদায় করেছি	অভিভাবকের মন্তব্য
শনিবার	সালাতুল আওয়াবিন	মসজিদে	মাগরিবের সালাতের পর	
রবিবার				
সোমবার				
মঙ্গলবার				
বুধবার				
বৃহস্পতিবার				
শুক্রবার				

সাওম (أَلصَّوْمُ)

সাওম ইসলামের তৃতীয় রুকন। ধনী-গরিব নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক সবার ওপর রমযান মাসে রোযা রাখা ফরয। সাওমের প্রতিদান আল্লাহ তা'আলা নিজেই দিবেন। পানাহার না করার কারণে রোযাদার ব্যক্তির মুখে যে গন্ধ তৈরি হয়, তা আল্লাহ তা'আলার নিকট মিশকের সুগন্ধ থেকেও অধিক প্রিয়। রমযান মাস, সিয়াম পালন, তারাবিহর সালাত ও লাইলাতুল ক্বদর সবই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর উম্মতের জন্য বিশেষ উপহার।

সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা সাওম পালন সম্পর্কে বেশ কিছু বিধি-বিধান শিখেছো। তারই ধারাবাহিকতায় এবার তোমরা সাওমের প্রস্তুতি, রমযান মাসের ফযিলত, লাইলাতুল ক্বদরের মাহাত্ম্য, ঈদ ও ঈদের দিন করণীয় সম্পর্কে জানতে পারবে। তোমরা যথাযথভাবে সাওম পালন করার মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করতে পারবে ও সে অনুযায়ী মানবিক জীবন গঠন করতে পারবে। তাহলে চলো! এবার আমরা মূল আলোচনা শুরু করি।

প্রিয় শিক্ষার্থী, ইবাদাত অধ্যায়ের সাওম সম্পর্কে আলোচনার শুরুতে তুমি/তোমরা বিগত রমযান মাসে যেসব ইবাদাত করেছ, তোমার বন্ধুর সাথে সেসব ইবাদাতের অভিজ্ঞতা বিনিময় করো। তুমি/তোমরা বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে বিগত রমযান মাসের স্মৃতিচারণ করে যা যা পেলে, তা নিচের ছকে লিখে ফেলো।

জোড়ায় কাজ

স্মৃতির পাতায় সাওম

কার্যক্রমসমূহ	বিগত রমযান মাসে তুমি/তোমরা যা করেছ
বিগত রমযান মাসে যে ইবাদাত/আমল বেশি বেশি করেছি।	কুরআন তিলাওয়াত।
সাওমের যে কার্যক্রমটি বেশি ভালো লাগে।	
বিগত রমযান মাসের স্মরণীয় কোনো মুহূর্ত।	
সাওমের যে শিক্ষা/তাৎপর্য বাস্তব জীবনে চর্চা করি।	

সাওমের প্রস্তুতি

রমযান মুমিনের ইবাদাত ও আত্মশুদ্ধির মাস। দিনে সাওম পালন, সন্ধ্যায় ইফতার করা, রাতে তারাবিহর সালাত ও শেষ রাতে সাহরি খাওয়া। আমরা এভাবেই ইবাদাতে মশগুল হয়ে রমযান অতিবাহিত করি। সেজন্য আমাদের উচিত যথাযথ শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

রজব মাস থেকেই রাসুলুল্লাহ (সা.) সাওমের প্রস্তুতি শুরু করতেন। প্রিয় নবি করিম (সা.) রজব ও শাবান মাসের

বরকত লাভ ও রমযান পর্যন্ত হায়াত বৃদ্ধির জন্য মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করতেন। তিনি বলতেন,

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

অর্থ: 'হে আল্লাহ! রজব মাস ও শাবান মাসে আমাদের বরকত দান করুন আর আমাদের রমযানে পৌঁছিয়ে দিন।' (মুসনাদে আহমাদ)

সারাদিন পানাহার না করে সাওম পালন করা কষ্টসাধ্য কাজ। তাই শাবান মাসে যথাসম্ভব নফল রোযা রেখে, রোযা রাখার অভ্যাস করতে হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) শাবান মাস প্রায় পুরোটাই রোযা রাখতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে শাবান মাসের চেয়ে অধিক (নফল) সাওম অন্য মাসে পালন করতে দেখিনি। (বুখারি)

রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে শাবান মাসের অত্যাধিক রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, এ মাসে বান্দার আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। আমি চাই, ফেরেশতাগণ আমার আমল আল্লাহ তা'আলার নিকট পেশ করার সময় আমি যেন রোযা অবস্থায় থাকি। রমযানের পূর্ববর্তী মাস হওয়ার কারণে শাবান মাসও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। আমাদের দেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশে শাবানের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাত শবে বরাত হিসেবে পরিচিত। হাদিসে এ রাতকে লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান বা 'মধ্য শাবানের রজনী' বলা হয়েছে। এ রাতের ফযিলত ও মর্যাদা বিষয়ে বেশ কিছু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা মধ্য শাবানের রাতে তাঁর সৃষ্টির (বান্দাদের) প্রতি দৃষ্টি দেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত সবাইকে ক্ষমা করে দেন। (ইবন মাজাহ) তাই এ রাতে এমন কাজ করবো, যাতে হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয় ও আমাদের মাঝে ভালোবাসা তৈরি হয়। আমরা অন্যকে ক্ষমা করে দিব ও অপরের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিব, তাহলে আল্লাহ তা'আলাও আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।

এ রাতে অনেক প্রসিদ্ধ তাবেয়ী সুন্দর পোশাক পরিধান করে, আতর ও সুরমা মেখে মসজিদে সমবেত হতেন এবং সালাত আদায় করতেন। তাই আমরা মধ্য শাবানের রাতে যথাসাধ্য ইবাদাত করবো, নফল সালাত আদায় করবো, আল্লাহ তা'আলার নিকট নিজের ও পরিবার পরিজনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো ও দিনে রোযা রাখবো। কারণ রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ এ তিন দিন রোযা রাখতেন। অনেকে শবে বরাতের রাতে আতশবাজি করে, মোমবাতি জ্বালায়। এগুলো অত্যন্ত গর্হিত কাজ। আমরা এসব শরিয়তবিরোধী কাজ থেকে দূরে থাকবো।

আমরা রজব ও শাবান মাসের হিসাব রাখব। সম্ভব হলে আমরা রমযানের চাঁদ দেখার চেষ্টা করবো। চাঁদ দেখা সুন্নাত। কিন্তু আমরা বর্তমানে এ বিষয়ে খেয়াল রাখি না।

রমযান কুরআন নাযিলের মাস। তাই এ মাস আসার আগে থেকেই আমরা বেশি বেশি কুরআন মাজিদ অধ্যয়ন করবো। জামাতে সালাত আদায়ের অভ্যাস করবো ও নফল সালাত আদায় করবো। গুনাহের কাজ পরিত্যাগ করবো। যথাযথ পরিকল্পনা ব্যতীত কোনো কাজেই সফল হওয়া যায় না। তাই রমযানের জন্য আমরা প্রস্তুতি

নেব। যে পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করবে, রমযানে সে যথাযথ ইবাদাত করতে পারবে। আর প্রস্তুতির অভাবে আমরা যদি ইবাদাত করতে না পারি, তাহলে রমযানের রহমত-বরকত থেকে আমরা বঞ্চিত হবো। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলোমলিন হোক, যে রমযান পেল অথচ গুনাহ মাফ করাতে পারলো না। (তিরমিযি)

রমযান মাস আসার আগেই আমরা সারাদিনের ইবাদাতের পরিকল্পনা করবো। যেন কোনো ভাবেই রমযানের রহমত, বরকত থেকে আমরা বঞ্চিত না হই।

রমযান মাসের ফযিলত

রমযান বছরের শ্রেষ্ঠ মাস। রহমত, মাগফিরাত আর নাজাতের এক অনন্য মাস রমযান। এ মাসেই মহান আল্লাহ কুরআন মাজিদ নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى
وَ الْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ

অর্থ: 'রমযান মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হেদায়াতস্বরূপ এবং হেদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী হিসেবে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে এ মাসটি পাবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে।' (সূরা আল বাকারা, আয়াত: ১৮৫)

অন্য আসমানি কিতাবসমূহও রমযান মাসেই নাযিল হয়েছে। ইবরাহিম (আ.)-এর ওপর সহিফাসমূহ রমযানের প্রথম রাতে নাযিল হয়। ষষ্ঠ রমযানে তাওরাত নাযিল হয়। তেরোতম রমযানে ইনজিল নাযিল হয়। আঠারতম রমযানে যাবুর নাযিল হয়। কুরআন মাজিদ নাযিল হয় রমযান মাসের কদর রাতে।

কুরআন মাজিদই রমযানের সুমহান মর্যাদার কারণ। এ মাসে আসমান থেকে রহমত নাযিল হতে থাকে। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'রমযানে রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। শয়তানদেরকে শিকলে বেঁধে রাখা হয়।' (বুখারি)

রমযানে এক মাস সাওম পালন করা ফরয। সাওম আল্লাহ তা'আলার খুবই পছন্দনীয় ইবাদাত। তাই সাওমের প্রতিদান আল্লাহ তা'আলা নিজে দিবেন। এ মাসে বান্দা যেহেতু সাওম পালন করে, তাই আল্লাহ তা'আলা সকল ইবাদাতের সাওয়াব বহুগুণ বাড়িয়ে দেন। হাদিসে আরো বর্ণিত আছে, এ মাসে ওমরা আদায় করলে হজের সাওয়াব পাওয়া যায়। (বুখারি)

আল্লাহ তা'আলা গাফুরুর রাহিম। তিনি আমাদের গুনাহ মাফ করে দিতে চান। আমরা যাতে অন্যায় পথ ছেড়ে আল্লাহ তা'আলার পথে ফিরে আসি, সে জন্য রমযানে আমাদের গুনাহ মাফের অনন্য সুযোগ রেখেছেন। রমযান

মাসে একজন ঘোষণাকারী ফেরেশতা এ ঘোষণা দিতে থাকেন, 'হে কল্যাণ অনুসন্ধানকারী! অগ্রসর হও। হে পাপাসক্ত! (পাপ থেকে) বিরত হও।' আল্লাহ তা'আলা রমযানের প্রতি রাতেই অসংখ্য মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন।

রমযান ইবাদাতের মাস। আমরা দিনে সাওম পালন করি আর রাতে তারাবিহর সালাত আদায় করি। সাওম ও তারাবিহর সালাতের ফযিলত সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ
مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

অর্থ: 'যে ব্যক্তি ইমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রমযানে রোযা রাখেন, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।' (বুখারি) রাসুলুল্লাহ (সা) আরো বলেন, 'যে ইমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রমযানে রাত জেগে ইবাদাত করে (তারাবিহর সালাত আদায় করে), তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।' (বুখারি)

এ মাসেই আল্লাহ তা'আলা বান্দার জন্য লায়লাতুল কদর তথা মহিমান্বিত রজনী রেখেছেন, যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। নবিজি (সা.) ইরশাদ করেন 'যে ব্যক্তি ইমানের সাথে সাওয়াবের আশায় কদরের রাত জেগে ইবাদাত করে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'। (বুখারি)

কঠিন কিয়ামতের দিনে রোযাদার বান্দার মুক্তির জন্য রোযা আল্লাহ তা'আলার কাছে সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, 'হে পরওয়ারদিগার! আমি তাকে (রমযানের) দিনে পানাহার ও প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিরত রেখেছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন।' কুরআন বলবে, 'আমি তাকে রাতের বেলায় নিদ্রা হতে বিরত রেখেছি। আমার সুপারিশ তার ব্যাপারে কবুল করুন।' তখন উভয়ের সুপারিশই কবুল করা হবে এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। (বায়হাকী)

এভাবে রোযা, তারাবিহর সালাত ও লায়লাতুল কদরের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বান্দার গুনাহ মাফের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। আমরা যতই অন্যায় করি না কেন, আল্লাহ তা'আলার রহমত তার চেয়েও বিস্তৃত। তাই রমযানে আমরা যথাযথভাবে সাওম পালন, বেশি বেশি নফল ইবাদাত ও তাওবা করবো যাতে আমাদের গুনাহ মাফ করিয়ে নিতে পারি। যে রমযান মাস পেল, অথচ তার গুনাহ মাফ করাতে পারলো না, তার মতো হতভাগা আর কেউ নেই। ইচ্ছাকৃত সাওম পরিত্যাগ করা কবিরা গুনাহ। সাওম পরিত্যাগকারীর জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। ইচ্ছাকৃত একটি রোযা পরিত্যাগ করলে, সারাজীবন রোযা রাখলেও রমযান মাসের একটি রোযার সমপরিমাণ সাওয়াব পাওয়া সম্ভব নয়। তাই আমরা রমযান মাসে বেশি বেশি ইবাদাত করবো, আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত রহমত বরকত লাভে ধন্য হবো।

একক কাজ

নিজেকে পরিশুদ্ধ করি, রমযান মাসে যে ইবাদাতগুলো অভ্যাসে পরিণত করি

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে তুমি রমযান মাসের যে ইবাদাতগুলো নিয়মিত পালন করো/ করবে তার একটি তালিকা করো।)

রমযান মাসে যেসব ইবাদাত করি	রমযান মাসে যেসব ইবাদাত করবো
পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাতের সাথে আদায় করি।	অর্থসহ কুরআন তিলাওয়াত করবো।

লায়লাতুল কদর

কদর অর্থ মহিমান্বিত, সম্মানিত, নির্ধারণ, ভাগ্য। লায়লাতুল কদরকে আমরা মহিমান্বিত রাত্রি বা ভাগ্যরজনী বলতে পারি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর প্রিয় হাবিব হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর উম্মতকে যে কয়েকটি বিশেষ নিয়ামত দান করেছেন, লায়লাতুল কদর তন্মধ্যে অন্যতম। এটি বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ রাত। এ রাতের মাহাত্ম্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

অর্থ: 'লায়লাতুল কদর হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।' (সূরা কদর, আয়াত: ৩)

যে ব্যক্তি লায়লাতুল কদরে রাত জেগে ইবাদাত করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে এক হাজার মাস ইবাদাতের সাওয়াব দান করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ইমানের সাথে সাওয়াবের আশায় কদরের রাত জেগে ইবাদাত করে, তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'। (বুখারি)

এ রাতে হযরত জিবরাইল (আ.) অগণিত ফেরেশতাসহ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রহমত, বরকত ও শান্তির বার্তা নিয়ে দুনিয়ায় অবতরণ করেন। তাঁরা রাত জেগে ইবাদাতকারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট রহমতের দোয়া করেন। ফজর উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার রহমতের অবিরত ধারা অব্যাহত থাকে। এ রাতেই আল্লাহ তা'আলা মানুষের আগামী এক বছরের ভাগ্য নির্ধারণ করেন। তিনি বান্দার দোয়া

কবুল করেন ও মনোবাসনা পূরণ করেন। তিনি তাওবাকারীর তাওবা কবুল করেন। বান্দা যত গুনাহগারই হোক না কেন, সে যদি আল্লাহ তা'আলার নিকট মাফ চায়, তিনি গুনাহ মাফ করে তাকে সম্মানিত করেন।

কুরআন মাজিদ সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। আল্লাহ তা'আলা এ রাতে লাওহে মাহফুজ থেকে দুনিয়ার আকাশে সমগ্র কুরআন মাজিদ নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে জিবরাইল (আ.) সেখান থেকে প্রয়োজন অনুসারে ওহি নিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট যেতেন। কুরআন মাজিদের কারণেই আল্লাহ তা'আলা এ রাতকে এত বেশি মর্যাদা দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّآ أَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ○

অর্থ: 'আমি একে (কুরআন মাজিদকে) বরকতময় রাতে নাযিল করেছি। নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী।' (সূরা আদ-দুখান, আয়াত: ৩)

লায়লাতুল কদরের অনুসন্ধান

এ রাতকে আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট করে দেননি বরং গোপন রেখেছেন, বান্দা যাতে বেশি বেশি ইবাদাত করে। রাসুল (সা.) রমযান মাসের শেষ দশকে লায়লাতুল কদর অনুসন্ধান করতে বলেছেন। হাদিসে পবিত্র রমযান মাসের শেষ দশকের বেজোড় রাতসমূহের কথাও বলা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.), ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সহ অনেক প্রসিদ্ধ আলিম রমযান মাসের ২৬ তারিখ দিবাগত ২৭ তারিখের রাতকে লায়লাতুল কদর বলে চিহ্নিত করেছেন।

আমাদের উচিত রমযান মাসের শেষ দশকে রাত জেগে বেশি বেশি ইবাদাত করা, যাতে কোনো অবস্থাতেই এ মহিমান্বিত রাতের রহমত-বরকত থেকে আমরা বঞ্চিত না হই। যে ব্যক্তি লায়লাতুল কদরের রহমত-বরকত থেকে বঞ্চিত হয়, তার মতো হতভাগা আর কেউ নেই।

লায়লাতুল কদরের আমল

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর কাছে লায়লাতুল কদরের দোয়া সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। তিনি তাঁকে নিম্নোক্ত দোয়াটি শিখিয়ে দেন:

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

অর্থ: 'হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, আপনি ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। তাই আমাকে ক্ষমা করে দিন।' (তিরমিযি)

রমযানের শেষ দশক ইতিকাফের সময়। ইতিকাফ হলো ইবাদাতের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করা। নারীরা তাদের বাসগৃহে নির্দিষ্ট স্থানে ইতিকাফ করবে। এ সময় ইতিকাফে থাকলে দশ দিনই ইবাদাতের মাধ্যমে কাটানো যায়, ফলে লায়লাতুল কদরের বরকত লাভের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

যে যত বেশি ইবাদাত করবে, সে তত বেশি সাওয়াব পাবে। আমরা এ রাতসমূহে তারাবির সালাত আদায় করবো, যথাসম্ভব কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করবো, তাসবিহ পাঠ করবো, জিকির করবো, তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করবো, রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ করবো। আমাদের পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য দোয়া করবো। কবরবাসীদের জন্য মাগফিরাত কামনা করবো। এভাবে ফজর নামায পর্যন্ত ইবাদাত করবো, যাতে আল্লাহ তা'আলা আমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন।

প্রতিফলন ডায়েরি লিখন

লায়লাতুল কদরের তাৎপর্য জেনেছি, লায়লাতুল কদরের যে যে ইবাদাতসমূহ আমি করবো।
(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে নির্ধারিত ছকটি তোমরা বাড়ি থেকে পূরণ করে নিয়ে আসবে। এক্ষেত্রে, তুমি তোমার পরিবারের সদস্য, সহপাঠী বা শিক্ষকদের সাহায্য নিতে পারবে।)

লায়লাতুল কদরের যে যে ইবাদাতসমূহ আমি করবো :
১.
২.
৩.
৪.

লায়লাতুল ক্বদর নিয়ে আলোচনা করি ও সে অনুযায়ী আমল করি।

১) লায়লাতুল কদরকে কি আমরা অন্য কোনো নামে জানি?
২) এক হাজার মাসে কত বছর হয়?
৩) রমযান মাসের শেষ দশ দিন কোন কোন ইবাদাত করলে লায়লাতুল কদরের ফযিলত পাওয়া যাবে?
৪) লায়লাতুল কদরের ইবাদাতের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করি ও সে অনুযায়ী আমল করি।

তাকওয়া অর্জনে সাওম

তাকওয়া ও সাওমের মাঝে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তাকওয়া আরবি শব্দ। এর অর্থ অন্যায় থেকে দূরে থাকা, আল্লাহকে ভয় করা। আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকার নাম তাকওয়া। তাকওয়ার কারণে মানুষ হারাম কাজ থেকে দূরে থাকে। পক্ষান্তরে সাওম পালনের জন্য আল্লাহর আদেশে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বান্দা পানাহার ও জৈবিক চাহিদা পূরণ থেকে দূরে থাকে অথচ সেগুলো হালাল। তাই সাওম উঁচু স্তরের তাকওয়াপূর্ণ ইবাদাত। তাকওয়া ব্যতীত সাওম পালন সম্ভব নয়। কারণ সাওম পালনকারীর অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয় না থাকলে সে লুকিয়ে খাবার খেতে পারতো। কিন্তু আল্লাহর ভয়েই সে সারাদিন পানাহার থেকে দূরে থাকে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সাওম পালনের আদেশ দিয়েছেন যাতে আমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারি।

মহান আল্লাহ বলেন,

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۙ

অর্থ: 'হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।' (সূরা আল বাকারা, আয়াত: ১৮৩)

সাওমের তিনটি দিক রয়েছে, রমযান মাসে সাওম পালনের ক্ষেত্রে এই দিকগুলো যথাযথ বাস্তবায়ন করলে আমরা পরিপূর্ণ মুত্তাকী হতে পারবো ।

প্রথম: সাওম পালনকারী ব্যক্তি পানাহার ও জৈবিক চাহিদা পূরণ থেকে দূরে থাকে। এর মাধ্যমে নফস (কুপ্রবৃত্তি) দুর্বল হয়ে পড়ে, অন্যায় কাজের প্রতি মানুষের সহজাত তাড়না কমে যায়, আত্মনিয়ন্ত্রণ সহজ হয়ে যায়। ফলে রোযাদারের মনে আল্লাহ তা'আলার ভয় প্রবল হয়।

দ্বিতীয়: রমযান মাসে সাওম পালনকারী দিনে রোযা রাখে, রাতে তারাবিহ সালাত আদায় করে। এভাবে দিন-রাত ইবাদাতে মশগুল থাকে। ক্ষুধাতুর শরীর অন্যায় কাজে সাড়া দেয় না। ফলে সাওম শয়তানের পথ রুদ্ধ করে, মানুষকে গুনাহ বর্জন করতে সাহায্য করে। সবাই ইবাদাতে উদ্বুদ্ধ থাকে। সমাজে অশ্লীল কাজ কমে যায়। রোযাদার অশ্লীল কথা বলে না ও অশ্লীল কাজ করে না। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'সাওম ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ যেন রোযা রেখে অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় ও ঝগড়া-বিবাদ না করে। কেউ যদি তাঁকে গালি দেয় অথবা তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে, আমি একজন রোযাদার।' (বুখারি)

তৃতীয়: রমযানে এক মাস সিয়াম পালন করে রোযাদার পানাহার বর্জন ও গুনাহের কাজ পরিত্যাগে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। সে আল্লাহর ইবাদাতের প্রকৃত স্বাদ পেতে শুরু করে। ইবাদাতের প্রতি তার আগ্রহ বেড়ে যায়। রোযাদার খাবার সামনে নিয়ে বসে থাকে অথচ আহার করে না। এভাবে রোযা ধৈর্যের শিক্ষা দেয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'রোযা সবরের অর্ধেক।' মানুষ পানাহার ও জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্যই বেশিরভাগ অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়। রোযা যেহেতু মানুষকে উভয় কাজ থেকে দূরে রাখে তাই আল্লাহকে স্মরণ করা সহজ হয়।

শয়তানের প্ররোচনা রোযাদারকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। সে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ মেনে চলে। এভাবে রোযাদার আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দায় পরিণত হয়।

সাওম আমাদেরকে তাকওয়ার পথ দেখায়। তাকওয়ার মাধ্যমে ইবাদাতে ইখলাস তৈরি হয়। ইখলাস অর্থ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে খুশি করার জন্য ইবাদাত করা। আল্লাহ তা'আলা ইখলাসপূর্ণ ইবাদাত কবুল করে উত্তম প্রতিদান দেন। ইখলাসের বিপরীত হলো রিয়া বা লৌকিকতা। রিয়া ইবাদাতকে ধ্বংস করে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের সমাজে অনেক মানুষ আছে যারা রোযা রাখে কিন্তু মিথ্যা কথা বলা ও অন্যায় কাজ পরিত্যাগ করতে পারে না। তাদের সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ
فِيْ أَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

অর্থ: 'যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল পরিত্যাগ করলো না, এমন ব্যক্তির পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।' (বুখারি)

শ্রেণিকক্ষে বসে থেকেও কোনো শিক্ষার্থী যদি শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ না করে, তাহলে ঐ শিক্ষার্থী যেমন কোনো কিছুই শিখতে পারে না, ঠিক তেমনি সারাদিন পানাহার ত্যাগ করেও, মিথ্যা ও অশ্লীলতা বর্জন করতে না পারলে, রোযাদার কোনো সাওয়াব পায় না। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوْعُ وَرُبَّ قَائِمٍ
لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ

অর্থ: 'অনেক রোযাদার রোযা থেকে ক্ষুধার কষ্ট ব্যতীত আর কিছু লাভ করতে পারে না। অনেক তাহাজ্জুদ আদায়কারী তাহাজ্জুদ থেকে রাত জাগরণ ব্যতীত আর কিছু লাভ করতে পারে না।' (ইবন মাজাহ)

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজিদে অসংখ্য আয়াতে আমাদেরকে তাকওয়া অবলম্বন করতে আদেশ দিয়েছেন। কারণ মুত্তাকী ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে মর্যাদাবান। কুরআন মাজিদের ঘোষণা, 'তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মর্যাদাবান, যার তাকওয়া সবচেয়ে বেশি।' (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৩) রমযানের রোযা আমাদের এই তাকওয়া অর্জনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ঈদুল ফিতর

ঈদ অর্থ খুশি, আনন্দ, উৎসব ইত্যাদি। ফিতর অর্থ রোযা ভঙ্গ করা। ঈদুল ফিতরের আভিধানিক অর্থ রোযা ভঙ্গ করার উৎসব। শাওয়াল মাসের প্রথম দিন ঈদুল ফিতর উদযাপন করা হয়। এক মাস সাওম পালন করার পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা শাওয়াল মাসের প্রথম দিনকে রোযাদারের জন্য আনন্দ উদযাপন করার দিন হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। মহানবি (সা.) হিজরতের পর মদিনায় এসে মদিনাবাসীদের নির্দিষ্ট দুই দিন আনন্দ-উৎসব ও খেলাধুলা করতে দেখলেন। মহানবি (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, এ দু'দিন কিসের? তারা বললো, আমরা জাহিলি যুগে এ দুই দিন আনন্দ-উৎসব ও খেলাধুলা করতাম। তখন মহানবি (সা.) বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এ দুই দিনের পরিবর্তে তোমাদের জন্য এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ দুটি দিন দান করেছেন। আর তা হলো ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর। (আবু দাউদ)

দলগত কাজ

ঈদের দিনে আমাদের করণীয় ও বর্জনীয় কার্যাবলি

উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করে ঈদের দিনে করণীয় ও বর্জনীয় দিকগুলোর তালিকা তৈরি করো।

ঈদের দিনে করণীয়	ঈদের দিনে বর্জনীয়
সুন্দর পোশাক পরিধান	বাজি, পটকা ফোটানো

ঈদুল ফিতরের দিনে করণীয়

ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের সালাত আদায় করা ওয়াজিব। ঈদের সালাত খোলা ময়দানে বা ঈদগাহে আদায় করা উত্তম। মসজিদেও ঈদের সালাত আদায় করা যায়। উৎসব উদযাপনেও ইসলাম সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধকে গুরুত্ব দিয়েছে। অভাবী ও গরীব মানুষেরাও যেন উৎসব উদযাপন করতে পারে, সে জন্য আল্লাহ তা'আলা সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর সাদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব করে দিয়েছেন। ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের সালাত আদায়ের পূর্বে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতে হয়। কোনো কারণে আদায় করতে না পারলে পরবর্তীতে আদায় করতে হবে। কিন্তু দেরি করার কারণে এটি সাধারণ দান হিসেবে পরিগণিত হবে।

ঈদের দিনের কিছু সুন্নাত আমল নিচে তুলে ধরা হলো:

১. ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে গোসল করা।

২. সকালে কিছু খেয়ে ঈদের সালাত আদায় করতে যাওয়া। সাধারণত রাসুলুল্লাহ (সা.) বেজোড় সংখ্যক খেজুর খেয়ে ঈদের সালাত আদায় করতে যেতেন।

৩. পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও উত্তম পোশাক পরিধান করে ঈদগাহে যাওয়া। আতর বা সুগন্ধি ব্যবহার করা ও চোখে সুরমা লাগানো।

৪. যথাসম্ভব পায়ে হেঁটে ঈদের সালাত আদায় করতে যাওয়া।

৫. ঈদের সালাত আদায় করতে যাওয়ার সময়, সালাত আদায়ের আগে ও ঈদগাহে অবস্থানকালে তাকবির বলা। তাকবির বিভিন্নভাবে পড়া যায়। সাধারণত আমরা নিম্নোক্ত তাকবির পাঠ করি।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ○

উচ্চারণ: 'আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হামদ।'

অর্থ: 'আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, তিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। আর তিনিই মহান, তিনি মহান ও তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা।'

৬. এক পথে ঈদগাহে যাওয়া ও ভিন্নপথে বাড়ি ফেরা। রাসুলুল্লাহ (সা.) ঈদের দিন বাড়ি ফেরার সময় ভিন্ন পথে ফিরতেন।' (বুখারি)

৭. শিশুদের ঈদগাহে নিয়ে যাওয়া। রাসুলুল্লাহ (সা.) ঈদের সালাত আদায়ের জন্য পরিবারের শিশুদের নিয়ে আসতেন।

৮. সালাত শেষে খুতবা শোনা। খুতবা না শুনে চলে আসলে গুনাহগার হতে হবে।

ঈদের আনন্দ উদযাপন

ঈদের দিন পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে কুশল বিনিময় করা ও তাদের খোঁজ-খবর নেওয়া উচিৎ। সাহাবিগণ ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের সময় বলতেন 'তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম'। অর্থ: 'আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও আপনাদের ভালো কাজগুলো কবুল করুন।' আমরা ঈদ মুবারক বা ঈদুকুম সাঈদ (তোমাদের ঈদ সৌভাগ্যমণ্ডিত হোক) বলেও ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করতে পারি। আমাদের উচিত ঈদের দিন সামর্থ্যানুযায়ী উত্তম খাবারের আয়োজন করা, নিজে আহার করা, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদেরকে আপ্যায়ন করা।

ঈদের আনন্দ উদযাপনের জন্য শরিয়ত অনুমোদিত খেলাধুলারও আয়োজন করতে পারি। ঈদের দিন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবিদের লাঠি খেলা ও আনন্দ করার কথা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। আনন্দ উদযাপনের পাশাপাশি আমরা আল্লাহর নিকট গুনাহ মাফ চাইব। কেননা রমযানে যার গুনাহ মাফ হয়নি, তার মতো হতভাগা আর কেউ নেই। একবার ঈদের দিন আবু হুরায়রা (রা.) উমর ফারুক (রা.) এর বাড়িতে গিয়ে দেখলেন, হযরত উমর (রা.) দরজা বন্ধ করে কাঁদছেন। আবু হুরায়রা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আমিরুল মু'মিনিন! লোকেরা আনন্দ উদযাপন করছে আর আপনি কাঁদছেন?' উমর ফারুক (রা.) বললেন, 'আনন্দিত লোকেরা যদি জানতো, তাহলে তারা আনন্দ উদযাপন করতো না'। একথা বলে তিনি পুনরায় কান্না শুরু করলেন আর বললেন, 'তাদের আমল (রমযানের সাওম, সালাত ও ইবাদাত) যদি কবুল হয়ে থাকে, তবে তারা আনন্দ উদযাপন করতে পারে। কিন্তু তাদের আমল যদি প্রত্যাখ্যাত হয়, তাদের কান্না করা উচিত। আর আমি জানি না আমার আমল কবুল হয়েছে নাকি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে'।

তাই ঈদের খুশির আতিশয্যে আল্লাহকে আমরা ভুলে থাকবো না। এমন কাজ করবো না, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) অপছন্দ করেন। আমরা ঈদের আনন্দ উদযাপনে, পোশাক-পরিচ্ছদ ও চাল-চলনে শালীনতা বজায় রাখবো। নতুন পোশাক পরিধান করলেও অহংকার প্রকাশ করবো না। নতুন পোশাক না থাকলে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবো। ঈদের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট নিজের,

পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য দোয়া করবো। আমাদের নিকটজন যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের কবর যিয়ারত করবো ও তাদের মাগফিরাত কামনা করবো। সর্বোপরি সবাই পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও মনোমালিন্য ভুলে প্রকৃত মুসলিম হবো এবং একতার বন্ধনে আবদ্ধ হবো।

বাড়ির কাজ

সাওমের শিক্ষা চর্চার কৌশল

সাওমের শিক্ষা/তাৎপর্য তোমার বাস্তব জীবনে/দৈনন্দিন কাজে কীভাবে অনুশীলন/ চর্চা করবে তার একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করো।

(উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা তৈরির ক্ষেত্রে তুমি তোমার মা-বাবা/অভিভাবক/ধর্মীয়জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সহায়তা নিতে পারো।)

সাওমের শিক্ষা	যেভাবে চর্চা করবো	চর্চা করা হয়েছে	মন্তব্য (অভিভাবক)
ভ্রাতৃত্ববোধ	অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করবো		

যাকাত (اَلزَّكٰوةُ)

প্রিয় শিক্ষার্থী, যাকাত ইসলামের মৌলিক পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম। এটি একটি আর্থিক ইবাদাত। আমরা পূর্বের শ্রেণিতে এ সম্পর্কে শিখেছি। এই অভিজ্ঞতায় আরো বিস্তারিত পরিসরে যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত, যাকাতের ধর্মীয় গুরুত্ব, যাকাত আদায় না করার পরিণাম, যাকাতের নিসাব এবং যাকাত হিসাব করার নিয়ম সম্পর্কে জানব। চলো আমরা অভিজ্ঞতাটি শুরুর আগে যাকাত সংক্রান্ত একটি ইসলামি ঘটনা শুনি।

বাড়ির কাজ

তুমি যাকাত সংক্রান্ত যে ইসলামিক ঘটনা/ গল্প শুনেছ বা জেনেছ তা পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য/সহপাঠীর সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় করো। ঘটনা/গল্পটি সংক্রান্ত তার/তাদের মতামত লিখে আনবে।

.....

.....

যাকাত পরিচিতি

যাকাত (اَلزَّكٰوةُ) অর্থ পবিত্রতা ও বৃদ্ধি। এছাড়া আধিক্য, বরকত ইত্যাদি অর্থেও যাকাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যাকাত প্রদানের মাধ্যমে যাকাত প্রদানকারী ব্যক্তির মনের কলুষতা দূরীভূত হয় এবং তাঁর সম্পদও পবিত্র হয়। এ জন্য এর অর্থ পবিত্রতা। তাছাড়া যাকাত দানকারীর সম্পদে আল্লাহ তা'আলা বরকত দান করেন। যাকাত প্রদানের ফলে সমাজে ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং সমাজের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়। এভাবে যাকাত প্রদানের মাধ্যমে সম্পদও বৃদ্ধি পায়। এজন্য যাকাতের অন্য অর্থ বৃদ্ধি।

ইসলামের পরিভাষায় ধনী ব্যক্তির সম্পদে দরিদ্র, অসহায়, গরীব, অভাবী ও নিঃস্ব ব্যক্তিদের আল্লাহ কর্তৃক সুনির্ধারিত যে অংশ রয়েছে, তা যথাযথভাবে আদায় করে দেওয়ার নামই যাকাত। যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন–

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ○

অর্থ: 'আর তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪৩)

মহানবি (সা.) বলেন–

اَدُّوْا زَكٰوةَ اَمْوَالِكُمْ

অর্থ: 'তোমরা তোমাদের মালের যাকাত প্রদান কর।' (তিরমিযি)

যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত

নামাযের মতো যাকাতও মুসলিমদের জন্য ফরয। কিন্তু সকলের উপর যাকাত বাধ্যতামূলক নয়। বরং যাকাত ফরয হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। যাকাত ফরয হওয়ার শর্তগুলো নিম্নরূপ:

১. **মুসলমান হওয়া:** যাকাত ফরয হওয়ার প্রথম শর্ত হলো মুসলমান হওয়া। কারণ যাকাত একটি ইবাদত। আর কাফির বা অমুসলিমের পক্ষ থেকে ইবাদত সাব্যস্ত হতে পারে না । তাই অমুসলিমের উপর যাকাত ফরয নয়। কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তবেই তাকে যাকাত দিতে হবে। মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাকে ইয়ামেন পাঠালেন ও বললেন, 'নিশ্চয়ই তুমি কিতাবধারী সম্প্রদায়ের কাছে যাত্রা করছ। সুতরাং তুমি তাদেরকে এই কথার প্রতি আহ্বান জানাবে যে, তারা সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসুল। যদি তারা ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি দিবারাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যদি তারা এ কথাটিও মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে অবহিত করবে যে, মহান আল্লাহ তাদের (ধনীদের) উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনী ব্যক্তিদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের গরীব মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হবে।' (বুখারি ও মুসলিম)

২. **নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া:** নিসাব পরিমাণ সম্পদ অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য বা সমমূল্যের সম্পদ থাকলে যাকাত ফরয হয়। কোনো মুসলিম ব্যক্তির নিকট নিসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকলে তার উপর যাকাত ফরয হবে না। কারণ রাসুলুল্লাহ (সা.) এ পরিমাণ সম্পদকে যাকাত ফরয হওয়ার কারণরূপে নির্ধারণ করেছেন। (হিদায়া)

৩. **নিসাব পরিমাণ সম্পদ প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া:** নিজের পরিবারের জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন: খাদ্যসামগ্রী, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, যানবাহন, কৃষি কাজের উপকরণ, শিক্ষাসামগ্রী ইত্যাদি ব্যতীত অবশিষ্ট সম্পদ নিসাব পরিমাণ হতে হবে। সারা বছর এসব মৌলিক প্রয়োজন মিটানোর পর যে সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকবে, শুধু তার উপর যাকাত ফরয হবে।

৪. **ঋণগ্রস্ত না হওয়া:** ঋণমুক্ত হওয়া যাকাত ফরয হওয়ার অন্যতম শর্ত। কোনো ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয নয়। তবে ঋণ পরিশোধের পর যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে তাহলে অবশ্যই তাকে অবশিষ্ট সম্পদের যাকাত প্রদান করতে হবে। নিজ ও পরিবারের প্রয়োজন পূরণের জন্য বাধ্য হয়ে যে ঋণ নেওয়া হয়, তার সমপরিমাণ সম্পদ বাদ দিয়ে যাকাতের হিসাব করতে হবে। তবে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ উন্নয়নের জন্য যে ঋণ নেওয়া হয়, যেমন: কল-কারখানা বানানো, ভাড়া দেওয়া বা বিক্রি করার উদ্দেশ্যে বাড়ি বানানো অথবা অন্য যে কোনো ধরনের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ঋণ নিলে যাকাত হিসাবের সময় সে ঋণ ধর্তব্য হবে না। এ ধরনের ঋণের কারণে যাকাত কম দেওয়া যাবে না। (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক)

৫. **সম্পদ এক বছর স্থায়ী হওয়া:** নিসাব পরিমাণ সম্পদ এক বছর নিজ আয়ত্তাধীন থাকা যাকাত ফরয হওয়ার অন্যতম শর্ত। তাই নিসাব পরিমাণ সম্পদ এক বছর কাল স্থায়ী না হলে তার উপর যাকাত ফরয হবে না। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি রাসুল (সা.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোনো সম্পদের যাকাত নেই।' (ইবন মাজাহ) তবে কৃষিজাত ফসল, খনিজদ্রব্য ইত্যাদির যাকাতের ক্ষেত্রে এ শর্ত প্রযোজ্য নয়।

৬. **জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া:** যাকাত ফরয হওয়ার অন্যতম শর্ত বিবেকবান ও জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া। বিবেক-বুদ্ধিহীন পাগলের উপর উপর যাকাত ফরয নয়।

৭. **বালেগ হওয়া:** যাকাতদাতাকে অবশ্যই বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। বালেগ হওয়ার আগে তার উপর যাকাত ফরয হবে না।

৮. **স্বাধীন হওয়া:** যাকাত প্রদানকারী ব্যক্তিকে স্বাধীন বা মুক্ত হতে হবে। পরাধীন ব্যক্তি বা দাস-দাসীর উপর যাকাত ফরয নয়।

এছাড়া যাকাত ফরয হওয়ার জন্য যাকাতের সম্পদ বর্ধনশীল হওয়া এবং সম্পদের উপর মালিকের পূর্ণ মালিকানা থাকা আবশ্যক।

দলীয় কাজ

'আমার উপর যাকাত ফরয হলে কেন আমি/আমরা সঠিক নিয়মে যাকাত আদায় করবো'
(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে তুমি/তোমরা কেন যাকাত প্রদান করবে (ফরয হলে) এ সম্পর্কে তোমার নিজস্ব ভাবনা লিখে উপস্থাপন করো।)

যাকাতের ধর্মীয় গুরুত্ব

যাকাত মুসলমানদের জন্য অবশ্য পালনীয় ইবাদাত। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে এটি তৃতীয় স্তম্ভ। আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। যথা-

১. আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসুল-এ কথার সাক্ষ্য দান করা;

২. সালাত কায়েম করা;

৩. যাকাত প্রদান করা;

৪. হজ করা এবং

৫. রমযানের সিয়াম পালন করা। (বুখারি)

প্রত্যেক সামর্থ্যবান স্বাধীন মুসলমান নর-নারীকে যাকাত প্রদান করতে হয়। যাকাত প্রদান করলে আল্লাহ তা'আলা তার সম্পদে বরকত দান করেন এবং এর বিনিময়ে আখিরাতে তাকে অফুরন্ত কল্যাণ প্রদান করবেন। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ পাক বলেন, 'হে বনি আদম! আমার পথে খরচ করতে থাকো। আমি আমার অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে তোমাদের দিতে থাকবো।' (বুখারি ও মুসলিম)।

কুরআনের অসংখ্য স্থানে নামাযের সাথে সাথে সমান গুরুত্ব দিয়ে যাকাত প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যার ওপর যাকাত ফরয হয়েছে, তাকে অবশ্যই যাকাত আদায় করতে হবে। হযরত আবু বকর (রা.) যাকাত আদায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তিনি যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। কেউ এই ফরযকে অস্বীকার করলে সে কাফির হয়ে যায়। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ
وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝

অর্থ: 'মুশরিকদের জন্য শুধুই ধ্বংস, যারা যাকাত আদায় করে না, তারা আখিরাতেও অবিশ্বাসী (কাফির)।' (সূরা হা-মিম আস সাজদাহ, আয়াত : ৬-৭)

মানুষ তার সম্পদকে বেশি ভালোবাসে। এজন্য মানুষ সম্পদ আহরণের জন্য দিনরাত পরিশ্রম করে। তাই মুমিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় ধন-সম্পদের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন। আল্লাহ দেখতে চান যে, কে তাঁর আনুগত্য করে এবং কে অবাধ্য হয়। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, 'নিশ্চয় তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ'। (সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ১৫) মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য সেই সম্পদকে দান করে থাকে।

যাকাত প্রদানের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র সাহায্য-সহযোগিতা নয়। এর উদ্দেশ্য হলো মানুষের মনকে পরিশুদ্ধ করা। একজন মুসলিম স্বেচ্ছায় যাকাত প্রদান করার মাধ্যমে তার ধন-সম্পদের জন্য আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এর ফলে তার মনে ভালোবাসা জন্মায় এবং সে আত্মিক শান্তি পায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তাদের সম্পদ হতে 'সাদাকা' গ্রহণ করুন। এর দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন। আপনি তাদের জন্য দোয়া করবেন। আপনার দোয়া তো তাদের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' (সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ১০৩)

দলগত কাজ

'যাকাত প্রদান করলে আল্লাহ তা'আলা তার (যাকাত প্রদানকারীর) সম্পদে বরকত দান করেন' (উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক দলে বিভক্ত হয়ে দলে/প্যানেলে উপস্থাপনা করো।)

যাকাত আদায় না করার পরিণাম

যাকাত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য অবশ্যপালনীয় নির্দেশ। যাকাত আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্যকর্তব্য। যাকাত প্রদানকারীকে আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে অফুরন্ত কল্যাণ দান করবেন। আর যাকাত অস্বীকারকারীর জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা।

যে ব্যক্তি যাকাত অস্বীকার করে এবং যাকাত আদায় করে না, সে মহাপাপী। এ জন্য তাকে জাহান্নামের কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ ۙ

অর্থ: 'যারা স্বর্ণ-রৌপ্য জমা করে রাখে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন'। (সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৩৪)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের কপালে, পাঁজরে ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, এগুলোই সে সমস্ত সোনা-রূপা, যা তোমরা জমা করতে। কাজেই তোমরা যা জমা করেছিলে তার স্বাদ ভোগ কর'। (সূরা আত-তওবা, আয়াত: ৩৫)

এ আয়াতে যাকাত প্রদান না করার যে কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তার এ শাস্তি তারই অর্জন। যাকাত না দিয়ে সম্পদ জমা করে রাখলে, সে সম্পদই তার জন্য কিয়ামতের দিন আযাবের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এ আয়াতে কপাল, পাঁজর ও পিঠ দগ্ধ করার কথা এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহর পথে খরচ করতে চায় না, তার কাছে যখন কোনো ভিক্ষুক কিছু চায়; কিংবা যাকাত প্রত্যাশা করে, তখন সে প্রথমে ভ্রূকুঁচকে ফেলে, তারপর পাশ কাটিয়ে তাকে এড়িয়ে যেতে চায়। এতেও সে ক্ষান্ত না হলে তাকে পিঠ দেখিয়ে চলে যায়। এজন্য বিশেষ করে এ তিন অঙ্গে আযাব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। (কুরতুবি)

রাসুলুল্লাহ (সা.) যাকাত আদায় না করার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে মুমিনদেরকে বারবার সতর্ক করেছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'সোনা-রূপার অধিকারী যেসব লোক এর হক (যাকাত) আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তার ঐ সোনা-রূপা দিয়ে তার জন্য আগুনের বহু পাত তৈরি করা হবে। অতঃপর সেগুলোকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে। তা দিয়ে তার ললাট, পাঁজর ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। যখনই সে পাত ঠান্ডা হয়ে আসবে, পুনরায় তা উত্তপ্ত করা হবে। আর তার সাথে এরূপ করা হবে এমন এক দিন, যার পরিমাণ হবে ৫০ হাজার বছরের সমান। তার এমন শাস্তি মানুষের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। অতঃপর তাদের কেউ পথ ধরবে হয় জান্নাতের দিকে আর কেউ দোযখের দিকে।' (মুসলিম)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে টেকো মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু'পাশে কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার জমাকৃত মাল।' (বুখারি)

রাসুলুল্লাহ (সা.) আরো বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজের উটের হক (যাকাত) আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন সে উট দুনিয়ার চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে খুর দিয়ে আপন মালিককে পিষ্ট করতে থাকবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি বকরির হক আদায় করবে না, সে দুনিয়ার চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে মালিককে খুর দিয়ে পদদলিত করবে এবং শিং দিয়ে আঘাত করবে।' (বুখারি)

যারা কৃপণতা করে যাকাত আদায় করে না, তাদের জন্য দুঃসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী, আল্লাহর বান্দাদের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম থেকে দূরবর্তী। অপরদিকে কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ থেকে দূরে, আল্লাহর বান্দাদের থেকে দূরে এবং জাহান্নামের সন্নিকটে। আর একজন জাহিল দানশীল একজন কৃপণ আবেদ অপেক্ষা আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়'। (তিরমিযি)

সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিতকরণের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে যাকাত। তাই আমাদের কর্তব্য হলো নিজে যাকাত প্রদান করা এবং অন্যকে যাকাত দানে উৎসাহিত করা। এভাবে সমাজের ধনী-গরীবের বৈষম্য কমে আসবে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা হবে।

দলগত কাজ

'প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলিমের উচিত সঠিক নিয়মে যাকাত প্রদান করা'
(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে তোমরা সঠিক নিয়মে যাকাত প্রদানের গুরুত্ব দলে আলোচনা করে উপস্থাপন করো।)

যাকাতের নিসাব

নিসাব (نِصَاب) আরবি শব্দ। এর অর্থ নির্ধারিত পরিমাণ। শরিয়তের পরিভাষায় যাকাত ফরয হওয়ার জন্য সম্পদের নির্ধারিত পরিমাণকে নিসাব বলা হয়। অর্থাৎ 'নিসাব' হলো যাকাত ফরয হওয়ার জন্য সম্পদের নির্ধারিত নিম্নতম সীমা বা পরিমাণ। সারা বছর জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর বছর শেষে যার হাতে নিসাব পরিমাণ সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকে তাকে সাহিবে নিসাব বা নিসাবের মালিক বলা হয়। আর সাহিবে নিসাবের উপরই যাকাত ফরয হয়।

নিসাবের পরিমাণ হলো, সাড়ে বায়ান্ন (৫২.৫) তোলা রূপা (প্রায় ৬১৩ গ্রাম) বা সাড়ে সাত (৭.৫) তোলা সোনা (প্রায় ৮৮ গ্রাম) বা এর সমমূল্যের সম্পদ। এই পরিমাণ নির্ধারণে ব্যক্তির সর্বমোট আয় থেকে যাবতীয় ব্যয় বাদ

দেওয়ার পর উদ্বৃত্ত অর্থ এবং তার পূর্বের সঞ্চয় ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ যুক্ত হবে। নগদ অর্থ, ব্যাংকে জমাকৃত অর্থ এবং ব্যবসায়িক পণ্য, স্বর্ণ, রৌপ্য, শেয়ার, ব্যাংক নোট, স্টক, অংশীদারী কারবার, প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রভৃতি সম্পদ যুক্ত করে যদি উক্ত নিসাব পরিমাণ সম্পদ হয় তাহলে তাকে ২.৫% হারে যাকাত দিতে হবে। তবে কৃষিজাত দ্রব্য, গবাদি পশু ও খনিজ সম্পদের যাকাতের নিসাব ও যাকাতের হার ভিন্ন ভিন্ন।

নিসাব পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি সম্পদ কারো কাছে এক বছর কাল স্থায়ী থাকলে ঐ সম্পদের মূল্যের চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত হিসাবে দেওয়া ফরয। শতকরা হিসাবে এর পরিমাণ হলো ২.৫%। কিন্তু সম্পদ নিসাব পরিমাণের কম হলে যাকাত দিতে হবে না। এক বছরকাল পূর্ণ না হলেও তার যাকাত নেই।

উৎপাদিত ফসল ও ফলের নিসাব

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, ধান, গম, যবসহ অন্যান্য ফসল অল্প হোক বা বেশি, ভূমি থেকে উৎপাদিত সকল শস্যের উপর উশর ওয়াজিব হবে। তা প্রবাহিত পানি দ্বারা সিঞ্চিত হোক, কিংবা বৃষ্টির পানি দ্বারা সিঞ্চিত হোক। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর দলিল হলো, রাসুল (সা.) এর বাণী: বৃষ্টির পানি থেকে যা উৎপন্ন করে, তাতে উশর ওয়াজিব হবে। (মুসনাদে আহমদ)

আর ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ ৫ ওয়াসাক হলে উশর ওয়াজিব হবে। এক ওয়াসাক হলো ৬০ সা এর সমপরিমাণ। এক সা হলো ৩২৭০.৬০ গ্রাম তথা ৩ কেজি ২৭০ গ্রামের কিছু বেশি। তাদের দলিল হলো রাসুল (সা.)–এর এই বাণী:

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

অর্থ: পাঁচ ওয়াসাকের কম হলে যাকাত ওয়াজিব নয়। (মুসলিম)

খনিজ সম্পদের নিসাব

স্বর্ণ, রৌপ্য, লোহা, সীসা, কিংবা তামা প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যের এক পঞ্চমাংশ অর্থাৎ শতকরা বিশভাগ (২০%) যাকাত দিতে হবে। মহানবি (সা.) বলেছেন–

وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ

অর্থ: ‘ভূ-গর্ভস্থ সম্পদের উপর এক-পঞ্চমাংশ যাকাত ওয়াজিব।’ (তিরমিযি)

গবাদি পশুর যাকাতের নিসাব

গরু, মহিষ, উট, ভেড়া, দুম্বা, ছাগল প্রভৃতি গবাদি পশুর নিসাবের পরিমাণ ও যাকাতের হারে ভিন্নতা রয়েছে। গরু বা মহিষ ৩০টি হলে; উট ৫টি হলে এবং দুম্বা, ছাগল বা ভেড়া ৪০টি হলে যাকাত ফরয হয়।

যাকাত হিসাব করার নিয়ম

যাকাত একটি আর্থিক ফরয ইবাদাত। বছরে একবার মালে নিসাবের অধিকারী ব্যক্তিকে যাকাত প্রদান করতে হয়। বছরের একটা নির্দিষ্ট দিন থেকে পরবর্তী বছরের ঐ নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব করে যাকাত প্রদান করতে হয়। এই দিন নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যে কোনো মাসের যে কোনো দিন নির্ধারণ করা যায়। সাধারণত হিসাব সংরক্ষণের সুবিধার্থে কেউ কেউ হিজরি বছরের প্রথম মাস মহররমের কোনো দিন নির্ধারণ করেন। আবার অনেকে বেশি সাওয়াবের আশায় রমযান মাসকে নির্ধারণ করে থাকেন। তবে যখন থেকে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবে, তখন থেকেই যাকাতের বছর গণনা শুরু করতে হবে। যে মাস থেকেই হিসাব রাখা হোক না কেন, হিসাব রাখতে হবে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে। সংরক্ষিত হিসাব অনুযায়ী নিসাব পরিমাণ সম্পদ এক বছর কাল স্থায়ী হলে যাকাত প্রদান করতে হবে; অন্যথায় নয়। যাকাত হিসাবের ক্ষেত্রে চন্দ্র বছরের হিসাব ধরা উত্তম।

কোনো ব্যক্তির যেদিন নিসাবের একবছর পূর্ণ হবে, সেদিন তার যাকাতযোগ্য যত সম্পদ আছে, সেগুলো তাকে একত্রে হিসাব করতে হবে। যেমন নগদ অর্থ, ব্যবসায়িক সম্পদ, স্বর্ণ-রৌপ্য, ব্যাংকে জমাকৃত টাকা ও অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ, প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমাকৃত টাকা, সঞ্চয়পত্রসহ অন্যসব জমানো সম্পদ একত্রে করে টাকায় রূপান্তর করে যে পরিমাণ সম্পদ হবে তার উপর ৪০ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ২.৫% হারে যাকাত প্রদান করতে হবে।

স্বর্ণ-রৌপ্য আলাদা আলাদা হিসাব করে যাকাতের নিসাব না হলে দুটোকে একত্র করে হিসাব করে নিসাব পরিমাণ হলে তার যাকাত প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে স্বর্ণ বা রৌপ্য যে দ্রব্যের বাজার মূল্য হিসাব ধরলে গরীব ও অসহায় লোকজন বেশি উপকৃত হবে, সে দ্রব্যের বাজার মূল্য হিসাব ধরতে হবে।

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি মোট সম্পদ থেকে ঋণের সমপরিমাণ সম্পদ/টাকা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সম্পদ যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে তাকে অবশিষ্ট সম্পদের উপর যাকাত দিতে হবে। নিম্নের উদাহরণের মাধ্যমে আমরা ভালোভাবে যাকাতের হিসাব বুঝতে পারবো–

চলো, একটি উদাহরণের মাধ্যমে যাকাতের হিসাব দেখি:

বেগম তাহমিনা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক। নিসাব এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর বছর শেষে তাঁর নিকট নগদ অর্থ ৫৫,০০০ টাকা, ব্যবসায়িক সম্পদ ২৩০,০০০ টাকা, ব্যাংকে জমাকৃত ৩৫,০০০ টাকা এবং তার ৫ ভরি স্বর্ণ ও ১০ ভরি রৌপ্য রয়েছে। স্বর্ণের মূল্য ভরি প্রতি ৯০,০০০ টাকা এবং রূপার ভরি ১০,০০০ টাকা। এখন বেগম তাহমিনা কত টাকা যাকাত প্রদান করবেন?

ক্রমিক	সম্পদের নাম	সম্পদের পরিমাণ
১।	নগদ অর্থ	৫৫,০০০ টাকা
২।	ব্যবসায়িক সম্পদ	২,৩০,০০০ টাকা
৩।	ব্যাংকে জমাকৃত টাকা	৩৫,০০০ টাকা
৪।	স্বর্ণ (৫ ভরি × ৯০,০০০)	৪,৫০,০০০ টাকা
৫।	রৌপ্য (১০ ভরি × ১০,০০০)	১,০০,০০০ টাকা
৬।	অন্যান্য	২৫,০০০ টাকা
	মোট সম্পদের পরিমাণ	**৮,৯৫,০০০ টাকা**

এখন বেগম তাহমিনার যাকাতযোগ্য সম্পদের পরিমাণ–	
মোট সম্পদ	৮,৯৫,০০০ টাকা

বেগম তাহমিনার যাকাত দিতে হবে : ৮,৯৫,০০০ টাকার ২.৫% হারে অর্থাৎ ২২,৩৭৫ টাকা (বাইশ হাজার তিনশত পচাত্তর টাকা মাত্র)।

জোড়ায়/দলীয় কাজ

করিম সাহেবের কাছে ৩ তোলা স্বর্ণ, ২০ তোলা রূপা এবং ৪ লাখ টাকা ব্যাংকে গচ্ছিত রয়েছে। তোমরা শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক জোড়ায়/দলে আলোচনা করে করিম সাহেবের যাকাতের পরিমাণ নির্ণয় করো।

হজ (اَلْحَجُّ)

হজ আরবি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ ইচ্ছা করা, নিয়ত করা, বায়তুল্লাহ সফরের সংকল্প করা। আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের নিয়তে যিলহজ মাসের নির্দিষ্ট দিনসমূহে ইহরাম বেঁধে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ, আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থান, সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করা ও অন্যান্য কাজ সম্বলিত ইবাদাতের নাম হজ। হজ শারীরিক ও আর্থিক ইবাদাত এবং ইসলামের পাঁচটি রুকনের অন্যতম রুকন।

সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর জীবনে একবার হজ আদায় করা ফরয। একাধিকবার হজ আদায় করলে তা নফল হিসেবে গণ্য হবে। কেউ হজের বিধান অস্বীকার করলে, সে কাফির হিসেবে বিবেচিত হবে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, 'এক দিন রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণে বললেন, 'হে মানব সমাজ! তোমাদের

ওপর হজ ফরয করা হয়েছে। তাই তোমরা হজ আদায় করো।' এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রাসুল! তা কি প্রতি বছর?' তিনি নীরব থাকলেন এবং সে তিনবার কথাটি বলল। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'আমি 'হ্যাঁ' বললে তা (প্রতি বছরের জন্য) ওয়াজিব হয়ে যেত'। (মুসলিম)

যেহেতু মানুষ যে কোনো সময় মৃত্যুবরণ করতে পারে, তাই হজ ফরয হওয়ার সাথে সাথে দেরি না করে তা আদায় করা অত্যন্ত জরুরি। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি হজ করার ইচ্ছা করে, সে যেন তা তাড়াতাড়ি আদায় করে নেয়।' (আবু দাউদ) যার ওপর হজ ফরয, কোনো কারণে আদায় না করলে মৃত্যুর পূর্বে হজের ওসিয়ত করা ওয়াজিব। উত্তরাধিকারীগণ তার পক্ষ থেকে হজ আদায় না করলে সে গুনাহগার হবে।

হজের ঐতিহাসিক পটভূমি

আল্লাহর নবিগণের স্মৃতিবিজড়িত নগরী মক্কাতুল মুকাররমা, কুরআন মাজিদে যাকে 'উম্মুল কুরা' বা আদি নগরী হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এখানে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতের উদ্দেশ্যে নির্মিত প্রথম ঘর বায়তুল্লাহ নির্মিত হয়। কালের বিবর্তনে এ জনপদ জনমানবহীন মরুভূমিতে রূপান্তরিত হয়। আর সেখানে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত বন্ধ হয়ে যায়।

হযরত ইবরাহিম (আ.) একজন অত্যন্ত মর্যাদাবান পয়গম্বর বা নবি। তিনি ইরাকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে ইবরাহিম (আ.) স্বীয় স্ত্রী হাজেরা ও শিশুপুত্র ইসমাইল (আ.) কে বায়তুল্লাহর নিকটবর্তী জনমানবহীন মরুভূমিতে সামান্য কয়েক দিনের খাদ্য ও পানীয় দিয়ে রেখে আসেন। হযরত হাজেরার আল্লাহর প্রতি অগাধ আস্থা ছিল। তিনি জানতেন নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁদের জন্য উত্তম রিযিকের ব্যবস্থা করবেন।

প্রিয় পুত্র ও স্ত্রীকে একাকী রেখে যাওয়ার সময় হযরত ইবরাহিম (আ.) আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করলেন। এ দোয়া আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজিদে বর্ণনা করেছেন: 'হে আমাদের রব! আমি আমার বংশধরদের কিছু সংখ্যককে আপনার পবিত্র ঘরের নিকটে ফসলহীন অনুর্বর উপত্যকায় বসবাস করালাম। হে আমাদের রব! এ জন্য যে, তারা যেন সালাত কায়েম করে। অতএব আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দিন এবং ফল-ফলাদি দিয়ে তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করুন, যাতে তারা শুকরিয়া আদায় করে।' (সূরা ইবরাহিম, আয়াত: ৩৭)

আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহিম (আ.) এর দোয়া কবুল করলেন। যখন ইসমাইল (আ.) ও তাঁর মা হাজেরার খাবার শেষ হয়ে গেল, ইসমাইল (আ.) ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হয়ে উঠলেন। মা হাজেরা বারবার সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের চূড়ায় উঠে চারদিকে তাকিয়ে দেখছিলেন, কোনো কাফেলা এই পথ দিয়ে যায় কি না। তাহলে তাদের কাছে একটু পানি পাওয়া যেতো। কিন্তু কোথাও কোনো মানুষ তিনি দেখতে পেলেন না। তিনি এভাবে সাতবার সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে দৌড়াদৌড়ি করলেন। পানি না পেয়ে মা হাজেরা শিশু ইসমাইল (আ.)-এর কাছে ফিরে আসলেন এবং বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দেখতে পেলেন, কাছেই মাটি ফুঁড়ে স্বচ্ছ পানির ফোয়ারা বইছে। এ পানির ফোয়ারাই হলো বিখ্যাত যমযম কূপ। মা হাজেরা শিশু ইসমাইল (আ.)কে

পানি পান করালেন, নিজেও পানি পান করে পরিতৃপ্ত হলেন। আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করলেন।

পানির মাধ্যমে তাঁদের খাবারের সমস্যাও মিটে গেলো। মরুভূমিতে পানির তীব্র সংকট। কোথাও পানি থাকলে সেখানে পাখিরা উড়াউড়ি করে, অনেক দূর থেকে দেখা যায়। পানির সন্ধানে অনেক কাফেলা সেখানে আসতে লাগলো। তারা পানি সংগ্রহ করে যাওয়ার সময় হযরত হাজেরা (আ.)-কে উপহার স্বরূপ খাদ্যদ্রব্য দিয়ে যেত। এভাবেই সেখানে মানুষের আনাগোনা শুরু হয়। জুরহাম গোত্রের এক কাফেলা মা হাজেরা (আ.)- এর অনুমতিক্রমে সেখানে বসবাস শুরু করে। ক্রমে আরো মানুষ বসবাস করতে থাকে। মক্কা নগরী ধীরে ধীরে জনপদে রূপান্তরিত হয়। সবাই হযরত ইসমাইল (আ.) ও তাঁর মা হাজেরাকে খুব সম্মান করতেন। কারণ তাঁদের কারণেই তো আল্লাহ তা'আলা ধু ধু মরুপ্রান্তরে শীতল পানির কূপের ব্যবস্থা করেছেন।

ইসমাইল (আ.) কিশোর বয়সে উপনীত হলে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত ইবরাহিম (আ.) এর ওপর আদেশ হলো প্রিয় পুত্র ইসমাইল (আ.)-কে কুরবানি করার জন্য। আল্লাহ তা'আলার হুকুম মেনে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ইবরাহিম (আ.) পুত্র ইসমাইল (আ.)-কে কুরবানি করতে প্রস্তুত হলেন। পিতা-পুত্র উভয়ে আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

মহান আল্লাহ পিতা ও পুত্রের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে কাবাঘর পুনর্নির্মাণের আদেশ দিলেন। তিনি ইবরাহিম (আ.)-কে কাবা ঘরের স্থানটি চিহ্নিত করে দিলেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'যখন আমি ইবরাহিমকে বায়তুল্লাহর স্থান ঠিক করে দিয়েছিলাম (আর বলেছিলাম) আমার সাথে কাউকে শরিক করো না। আর আমার ঘরকে পবিত্র রাখবে তাওয়াফকারী, নামাযে কিয়ামকারী, রুকুকারী ও সিজদাকারীদের জন্য।' (সূরা আল-হাজ, আয়াত ২৬)

হযরত ইবরাহিম (আ.), ইসমাইল (আ.) এর সহযোগিতায় কাবাঘর পুনর্নির্মাণ করলেন। এরপর মহান আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন,

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

অর্থ: 'হে আমাদের রব! আমাদের এ কাজ আপনি কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১২৭)

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে হযরত ইবরাহিম (আ.) মানুষকে বায়তুল্লাহর যিয়ারত ও হজ করার জন্য আহ্বান করেন। কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে,

وَ اَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّ عَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ

يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ○

অর্থ: 'আর মানুষের মাঝে হজের ঘোষণা করে দিন, তারা আপনার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সবধরনের কৃশকায় উটের পিঠে করে, তারা আসবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে।' (সূরা আল হাজ্জ, আয়াত ২৭)

পৃথিবীর নানা প্রান্তের মুমিনগণ বায়তুল্লাহর যিয়ারতে আসতে থাকলো। বায়তুল্লাহ মহান আল্লাহর ইবাদাতের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হলো। ইবরাহিম (আ.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত ইসমাইল (আ.) নবি হলেন। তিনি কাবা শরিফের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। এভাবে বংশানুক্রমিকভাবে তারা কাবা শরিফের তত্ত্বাবধান করতেন। কিন্তু কালক্রমে মানুষ আবার মহান আল্লাহকে ভুলে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। কাবাগৃহে ৩৬০ টি মূর্তি স্থাপন করে পূজা শুরু করে। হজ পালনের জন্য তারা নানা ভ্রান্ত নিয়ম চালু করে। তারা বিবস্ত্র হয়ে কাবাগৃহ তাওয়াফ করতো, আরাফার ময়দানে অবস্থান না করে আভিজাত্য বজায় রাখার জন্য মুযদালিফায় অবস্থান করতো। কিন্তু তখনো কুরাইশরাই কাবা শরিফ ও হজের তত্ত্বাবধায়ক ছিল। বায়তুল্লাহর তত্ত্বাবধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে আরব অঞ্চল ও অন্যান্য দেশে তাদের বিশেষ মর্যাদা ছিল। তাদের মাঝে অল্প সংখ্যক লোক ছিল তখনো মূর্তিপূজাকে ঘৃণা করতেন। তাদেরকে হানিফ বা আল্লাহ তা'আলার একনিষ্ঠ ইবাদাতকারী বলা হতো। তারা মূর্তিপূজা না করে ইবরাহিম (আ.)-এর অনুসরণে হজ আদায় করতেন। আমাদের প্রিয় মহানবি (সা.) এমন পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছোটোবেলা থেকে মূর্তিপূজা ঘৃণা করতেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কা বিজয়ের পর পুনরায় কাবা ঘরকে মূর্তিমুক্ত করেন ও হযরত ইবরাহিম (আ.)- এর অনুসরণে হজের বিধানাবলি প্রবর্তন করেন।

হজের ফযিলত

হজ মুসলিম জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আমল। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কোন আমলটি উত্তম?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের ওপর ঈমান আনা।' প্রশ্ন করা হলো, 'তারপর কোনটি?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।' প্রশ্ন করা হলো, 'তারপর কোনটি?' তিনি বললেন, 'মকবুল হজ।' (বুখারি)

আল্লাহ তা'আলা যে ব্যক্তির হজ কবুল করেন, তার জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে তাকে জান্নাত দান করেন। মহানবি (সা.) বলেন 'তোমরা হজ ও ওমরাহ মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখো। কেননা এ ইবাদাত দু'টি দরিদ্রতা ও গুনাহসমূহ এমনভাবে দূর করে দেয়, যেমন (কামারের আগুনের) হাপর লোহা, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ময়লা দূর করে বিশুদ্ধ করে দেয়। আর কবুল হজের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত কিছুই নয়'। (তিরমিযি)

রাসুলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন–

مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

অর্থ: 'যে ব্যক্তি এ ঘরের হজ করলো আর হজ পালনের সময় কোনো অশ্লীল কাজ করেনি এবং কোনো প্রকার পাপাচারে নিমজ্জিত হয়নি, সে হজ থেকে এমন নিষ্পাপ হয়ে ফিরবে, যেমন নিষ্পাপ অবস্থায় তাঁর মা তাকে জন্ম দিয়েছিলেন।' (বুখারি)

হজের গুরুত্ব

হজের বিধান ফরয হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ

অর্থ: 'আর তোমরা আল্লাহর জন্য হজ ও ওমরাহ পরিপূর্ণভাবে পালন কর।' (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৯৬)

বায়তুল্লাহর হজ চালু থাকা মুমিন জীবিত থাকার দলিল। আর যতদিন কোনো মুমিন পৃথিবীতে থাকবে, ততদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন,

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى لَا يُحَجَّ الْبَيْتُ

অর্থ: 'বায়তুল্লাহর হজ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না' (বুখারি)

হজের উদ্দেশ্যে রওনা হলে, হজ আদায় না করে মৃত্যুবরণ করলেও আল্লাহ তা'আলা তাকে হজের সাওয়াব দান করবেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি হজ, ওমরাহ অথবা আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশে বের হবে আর পথেই মৃত্যুবরণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে গাজি, হাজী বা ওমরাহ পালনকারীর সাওয়াব প্রদান করবেন'। (বায়হাকী)

রাসুলুল্লাহ (সা.) সামর্থ্যবান ব্যক্তির হজ পালনে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সুস্পষ্ট অভাব বা অত্যাচারী শাসকের বাধা অথবা মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হওয়া ব্যতীত হজ পালন না করে মৃত্যুবরণ করলো, সে ইহুদি হয়ে মৃত্যুবরণ করুক বা নাসারা হয়ে মৃত্যুবরণ করুক, তাতে আমার কিছু যায় আসে না'। (দারিমি)

হজের তাৎপর্য

হজ ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ। হজ পালনের সফরে আমরা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলি প্রত্যক্ষ করতে পারি, ফলে আমাদের ঈমান মজবুত হয়। তাকওয়া বা আল্লাহভীতি বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিদর্শনাবলির সম্মান সম্পর্কে বলেন–

وَ مَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ○

অর্থ: 'যে আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে সম্মান করে, নিঃসন্দেহে তা তাঁর অন্তরের তাকওয়া থেকেই করে।' (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৩২)

হজ আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের মাধ্যম। হজ মানুষকে অন্যায় অশ্লীলতা থেকে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনে।

মানুষ তাওবা করে, আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ চায়। সাদা ইহরামের কাপড় তাকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মানুষ তাঁর অসহায়ত্ব বুঝতে পারে। তাইতো আমরা হজ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মানুষের মাঝে আমূল পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করি।

হজ ইসলামের সাম্যনীতির প্রমাণ। লাখ লাখ হাজী সবাই একই পোশাকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে লাব্বাইক ধ্বনিতে নিজেদের উপস্থিতির জানান দেয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে সবাই সমান, সেটার স্পষ্ট প্রমাণ হজে পাওয়া যায়। হজের মাধ্যমে মুসলিমদের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় হয়। দেশ, ভাষা ও জীবনাচার আলাদা হওয়ার পরও সবাই সুশৃঙ্খলভাবে হজের কার্যাবলি আদায় করে, একে অপরকে সহযোগিতা করে। এক অতুলনীয় আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর এক প্রান্তের মানুষ অন্য প্রান্তের মানুষের সাথে মেলামেশার সুযোগ পায়। তাদের মাঝে আলোচনা করার ও সমস্যা সমাধানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। হজের ইমাম আরাফার ময়দানে বিশ্ব মুসলমানদের জন্য দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন, যা মুসলিম উম্মাহর জন্য পথনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে।

একজন মুমিন বান্দা প্রতিদিন বায়তুল্লাহর দিকে ফিরে সালাত আদায় করেন। হজের সফরে তিনি বায়তুল্লাহকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান। তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর রওজা মুবারক যিয়ারাত করারও সুযোগ পান। এসব মহিমান্বিত স্থানগুলোর ভ্রমণ মানুষের অন্তরে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এজন্য হজ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মুমিন ব্যক্তি প্রতিনিয়ত আল্লাহর পথে এগিয়ে যেতে শুরু করে।

একক/জোড়ায় কাজ

শিক্ষকের আজকের আলোচনার আলোকে শিক্ষার্থীরা হজের তাৎপর্য খাতায় (একক/জোড়ায়) লিখবে।

হজের ফরয

হজের ফরয তিনটি:

১. হজের নিয়ত করে ইহরাম বাঁধা।
২. উকূফে আরাফা অর্থাৎ ৯ই যিলহজ যোহর থেকে ১০ই যিলহজ ফজরের পূর্ব পর্যন্ত যে কোনো সময় কিছুক্ষণের জন্য আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা।
৩. তাওয়াফে যিয়ারত করা অর্থাৎ ১০ই যিলহজ ভোর থেকে ১২ যিলহজ সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে কোনো সময় কাবা শরিফ তাওয়াফ করা।

হজের ওয়াজিব

হজের ওয়াজিবসমূহ–

১. মিকাত অতিক্রম করার আগেই হজের নিয়ত করে ইহরাম বাঁধা।

২. ৯ যিলহজ আরাফার ময়দানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করা।

৩. আরাফা থেকে মিনায় ফেরার পথে ১০ই যিলহজ ফজর থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বে কিছু সময় মুযদালিফায় অবস্থান করা।

৪. সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা বা দৌড়ানো।

৫. ১০, ১১ ও ১২ যিলহজ শয়তানকে জামরায় পাথর নিক্ষেপ করা।

৬. মাথা মুণ্ডন করা বা চুল ছোট করা।

৭. মক্কার বাইরে থেকে আগত হাজীদের জন্য বিদায়কালীন তাওয়াফ বা তাওয়াফুল বিদা করা।

৮. তামাত্তু ও কিরান হজ আদায়কারীগণের জন্য শুকরিয়াস্বরূপ কুরবানি করা।

হজের সুন্নাত

হজের সুন্নাতসমূহ-

১. ইহরাম বাঁধার আগে গোসল করা; সম্ভব না হলে ওযু করা।

২. বেশি বেশি তালবিয়া পাঠ করা।

৩. মক্কার বাইরে থেকে আগত ব্যক্তিদের জন্য তাওয়াফে কুদুম (আগমনী তাওয়াফ) করা।

৪. তাওয়াফের সময় প্রথম তিন চক্কর সৈনিকের মতো বীরদর্পে চলা।

৫. ইমামের জন্য ৩টি খুতবা দেওয়া। ইমাম ৭ই যিলহজ তারিখ মক্কায়, ৯ই যিলহজ আরাফায় যোহরের নামাযের পূর্বে, ১১ই যিলহজ মিনায় যোহরের নামাযের পর হজের খুতবা প্রদান করেন।

৬. ৮ই যিলহজ মক্কা থেকে মিনায় যাত্রা করা, সেখানে পৌঁছে যোহর থেকে ৯ যিলহজ ফজর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা।

৭. ৯ই যিলহজ সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফাতের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া।

৮. উকুফে আরাফা বা আরাফাতে অবস্থানের পূর্বে গোসল করা।

৯. আরফার ময়দান থেকে ফেরার সময় ইমাম রওনা হওয়ার পরে রওনা হওয়া।

১০. আরাফা থেকে ফিরে মুযদালিফায় রাত কাটানোর পর ১০ই যিলহজ ফজরের নামায আদায় করে সূর্যোদয়ের পূর্বে মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া।

১১. জামরায় পাথর নিক্ষেপের জন্য ১০, ১১ ও ১২ যিলহজ মিনায় রাত্রিযাপন করা।

১২. যিলহজ মাসের ১১, ১২, ১৩ তারিখ পথর নিক্ষেপের সময় ক্রমধারা ঠিক রাখা।

১৩. মিনা থেকে ফেরার পথে 'মুহাসসার' নামক স্থানে কিছু সময় অবস্থান করা।

প্রতিফলন ডায়েরি লিখন (বাড়ির কাজ)

যেসব কার্যক্রমের মাধ্যমে হজের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত আদায় করা হয়।

তুমি/তোমরা শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক নিচের ছকটি পূরণ কর।

ক্রমিক	হজের নিয়ম	কার্যাবলি
১.	ফরয	
২.	ওয়াজিব	
৩.	সুন্নাত	

হজ ফরয হওয়ার শর্ত

হজ ফরয হওয়ার শর্ত পাঁচটি। যথা,

১. **মুসলিম হওয়া**

হজ ফরয হওয়ার প্রথম শর্ত হচ্ছে মুসলিম হওয়া।

২. **বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া**

অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকার ওপর হজ ফরয নয়। তবে তারা যদি হজ আদায় করে, হজের সাওয়াব পাবে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরে শারীরিক ও আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান হলে, তাদেরকে আবার হজ আদায় করতে হবে।

৩. **বোধশক্তি সম্পন্ন হওয়া**

বোধশক্তিহীন ব্যক্তির ওপর হজ ফরয নয়।

৪. **স্বাধীন হওয়া**

কোনো পরাধীন ব্যক্তির ওপর হজ ফরয নয়।

৫. **শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্য থাকা**

যে ব্যক্তি মক্কা শরিফ পর্যন্ত হজের সফরের যাতায়াত ও হজ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবার-

পরিজনের অত্যাবশকীয় ব্যয় নির্বাহ করতে পারে এবং শারীরিকভাবে সুস্থ আছে, তার ওপর হজ ফরয। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ

অর্থ: 'আর যে ব্যক্তির সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, তার ওপর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এ ঘরের হজ করা ফরয।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৭)

আর্থিক সামর্থ্যবান ব্যক্তি যদি হজের সফর করতে অক্ষম হন, তিনি অন্যের মাধ্যমে হজ আদায় করবেন। এমন হজকে বদলি হজ বলে। তবে কোনো ব্যক্তির হজ যাত্রার পথ নিরাপদ না হলে তার উপর হজ ফরয হবে না।

হজ আদায়কারী যদি মহিলা হন, তার সাথে তার স্বামী বা কোনো মাহরাম থাকতে হবে। ইসলামি শরিয়ায় মাহরাম বলা হয় এমন নিকটাত্মীয়কে যাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম। যেমন, বাবা, চাচা, মামা, ভাই, ছেলে ইত্যাদি। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'কোনো নারী যেন মাহরাম ছাড়া সফর না করে'। (বুখারি)

হজের মিকাত

ইহরাম বাঁধার নির্ধারিত স্থানকে মিকাত বলা হয়। হজ ও ওমরার জন্য বায়তুল্লাহ যাওয়ার পথে মিকাত অতিক্রম করার আগে ইহরাম বাঁধা ওয়াজিব। আকাশপথে বা জলপথে বা স্থলপথে যারা হজে গমন করেন, তাদেরকেও এই স্থানগুলা অতিক্রমের পূর্বেই ইহরাম বাঁধতে হয়। অঞ্চলভেদে মহানবি (সা.) ইহরামের জন্য পাঁচটি স্থানকে মিকাত হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মিকাত বা ইহরাম বাঁধার নির্ধারিত স্থানগুলো নিম্নরূপ:

১. ইয়ালামলাম

ইয়ালামলাম একটি উপত্যকা যা মক্কা থেকে বিরানব্বই কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটি ইয়ামেনবাসী ও সে পথে আগমনকারী হাজীদের মিকাত। এটি বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান থেকে আগত হাজীদেরও মিকাত। যেহেতু বর্তমানে বাংলাদেশের হাজীগণ আকাশপথে হজে গমন করেন, তাই যারা সরাসরি বায়তুল্লায় যান তারা ঢাকা বিমানবন্দর থেকে ফ্লাইটে উঠার আগেই ইহরাম বাঁধেন। তবে যারা শুরুতে মদিনায় যান, তাদেরকে ঢাকা থেকে ইহরাম বাঁধতে হয় না।

২. যুল-হুলায়ফা

মদিনা মুনাওয়ারা থেকে ও এ পথে মক্কা শরিফ আগমনকারীদের মিকাত হচ্ছে যুল হুলায়ফা। বর্তমানে এটি আবইয়ারে আলি বা বীরে আলি নামে পরিচিত। বাংলাদেশ থেকে হজ আদায় করতে যাওয়ার সময় যারা আগে মদিনায় যান, তাঁরাও হজ ও ওমরা পালনের জন্য যুলহুলাইফা থেকে ইহরাম বাঁধেন।

৩. যাতে ইরাক

ইরাকবাসী ও সে পথে আগমনকারী হাজীদের মিকাত। এটি একটি উপত্যকা।

৪. জুহফা

মিসর ও সিরিয়াবাসী এবং সেই পথে মক্কা মোকাররমা আগমনকারীদের মিকাত। এটি রাবাগ নামক স্থানের একটি বিরান গ্রাম। রাবাগে পৌঁছে ইহরাম বাঁধলেও কোনো সমস্যা নেই।

৫. করনুল মানাজিল

এটি নজদবাসী ও সে পথে আগমনকারীদের জন্য মিকাত তথা ইহরাম বাঁধার স্থান। এটি বর্তমানে 'আস-সায়েল' নামে পরিচিত।

হেরেমের বাইরে কিন্তু বর্ণিত পাঁচটি মিকাতের সীমানার ভেতরে যারা বসবাস করেন যেমন জেদ্দা, বাহরা, তায়েফ ও মক্কার মধ্যবর্তী এলাকার বাসিন্দাগণ বা চাকরিরত বিদেশিগণ, হজের জন্য তাদের নিজেদের ঘর থেকেই ইহরাম বাঁধা উত্তম। তারা চাইলে হেরেমের চৌহদ্দির বাইরে যে কোনো স্থান তথা সমগ্র 'হিল' থেকেও ইহরাম বাঁধতে পারেন। হেরেমের বাইরের এলাকা হলো 'হিল'। যারা হেরেমের ভেতরে বসবাস করেন তারা হজের ইহরাম হলে নিজ নিজ ঘর থেকে, আর ওমরাহর ইহরাম হলে হেরেমের সীমানার বাইরে যে কোনো স্থানে গিয়ে ইহরাম বাঁধবেন।

হজ ও ওমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে ইহরাম ব্যতীত মিকাত অতিক্রম করা জায়েজ নেই। কেউ ইহরাম ব্যতীত মিকাত অতিক্রম করলে, তাকে ইহরাম বাঁধার জন্য মিকাতে ফিরে যেতে হবে এবং সেখান থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে। যদি সেখানে ফিরে যাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে যেখানে আছে সেখান থেকেই ইহরাম বাঁধবে। তখন তার ওপর দম বা পশু কুরবানি দিয়ে ক্ষতিপূরণ দেওয়া ওয়াজিব হবে।

হজ পালনের নিয়ম

জাহেলি যুগে হজ পালনের ক্ষেত্রে নানা কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। যেমন তারা হজের নিয়ত করলে হজ আদায় না করা পর্যন্ত ঘরের দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ করাকে অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ হিসেবে বিশ্বাস করতো। তাই তারা সব সময় পেছনের দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ করতো। রাসুলুল্লাহ (সা.) সেসব কুসংস্কার দূর করেছেন। হজ ফরয হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবিদের হজের বিধান শিক্ষা দিয়েছেন। চলো এবার আমরা হজের নিয়মাবলি শিখি।

ইহরাম

ইহরাম আরবি শব্দ যার অর্থ নিষিদ্ধ। ইহরাম হজের আনুষ্ঠানিক নিয়ত। নির্দিষ্ট দিনে মিকাত থেকে ইহরামের কাপড় পরিধান করে হজের নিয়ত করাকে ইহরাম বলে। ইহরাম বাঁধার সাথে সাথে হজের নিষিদ্ধ কার্যাবলি থেকে দূরে থাকতে হবে। শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখ থেকে যিলহজ মাসের নয় তারিখের মাঝে যে কোনো সময় নির্দিষ্ট মিকাত থেকে ইহরাম বাঁধতে হয়। এর আগে বা পরে ইহরাম বাঁধলে হজ আদায় হবে না। ওযু ও

গোসল করে দুই রাকাআত নফল সালাত আদায় করে ইহরাম বাঁধতে হয়। ইহরাম বাঁধার সময় পুরুষের জন্য ইহরামের নির্দিষ্ট কাপড় তথা সেলাইবিহীন দুইটি চাদর পরিধান করতে হয়। নারীগণ স্বাভাবিক পোশাক পরিধান করবে, তবে মুখ খোলা রাখবে। কিবলামুখী হয়ে পুরুষগণ সশব্দে আর নারীগণ নিরবে তিনবার তালবিয়ার পাঠ করবে। আর তালবিয়া হলো–

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ - لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ -

إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ - لَا شَرِيْكَ لَكَ

অর্থ: 'আমি আপনার সমীপে হাযির, হে আল্লাহ! আমি আপনার সমীপে হাজির। আমি আপনার সমীপে হাযির, আপনার কোনো শরীক নেই, আমি আপনার সমীপে হাজির। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা ও নিয়ামতরাজি ও রাজত্ব আপনারই। আপনার কোনো শরিক নেই।' (বুখারি)

তারপর দরুদ পাঠ করে নিজের ইচ্ছামতো দোয়া করতে হয়। ইহরাম বাঁধার পর দোয়া করা সুন্নাত। হজ ও ওমরাহর উদ্দেশ্য ছাড়াও বহিরাগত কেউ (মক্কার বাইরে বসবাসকারী) বায়তুল্লাহ যিয়ারত করতে গেলে, তাকেও মিকাত থেকে ইহরাম বাঁধতে হয়।

তাওয়াফে কুদুম

তাওয়াফে কুদুম অর্থ আগমনী তাওয়াফ। মক্কার বহিরাগত হাজীগণ মক্কায় প্রবেশ করে প্রথমে বায়তুল্লায় গিয়ে যে তাওয়াফ করেন, তা তাওয়াফে কুদুম বা আগমনী তাওয়াফ নামে পরিচিত। তাওয়াফে কুদুম আদায় করা সুন্নাত। মক্কায় বসবাসকারী হাজীদের তাওয়াফে কুদুম করার প্রয়োজন নেই। কারণ তারা মক্কাতেই থাকেন। যে কোনো সময় ইচ্ছা করলেই তাওয়াফ করতে পারেন। আর যারা ওমরাহ করবে, তাদেরও আলাদা করে তাওয়াফে কুদুম করার প্রয়োজন নেই। কেননা ওমরাহর তাওয়াফ, তাওয়াফে কুদুমের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে গণ্য হয়।

যখন কাবা শরিফ দৃষ্টিগোচর হবে, আল্লাহু আকবার ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বে। হাজারে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করতে হয়। কোনো মুসলমানকে কষ্ট না দিয়ে যদি সম্ভব হয়, তাহলে হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করবে। হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা সম্ভব না হলে, হাজারে আসওয়াদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবার ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়বে। আর প্রতি চক্কর দেওয়ার সময় এভাবে হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করবে বা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবার ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বে। আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করবে ও রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর ওপর দরুদ পাঠ করবে। হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা সুন্নাত। আর কোনো মুসলিমকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব।

হাতিমের বাইরে দিয়ে তাওয়াফ করতে হয়। প্রথম তিন চক্কর দেওয়ার সময় রমল করতে হয়। রমল অর্থ বীরদর্পে দুই কাঁধ দুলিয়ে দ্রুত চলা। রমলের সময় ভিড়ের ভেতর পড়ে গেলে দাঁড়িয়ে যাবে। আবার যখন ফাঁকা

পাবে, তখন রমল করবে। অবশিষ্ট চার চক্কর স্বাভাবিক অবস্থায় চলতে হয়। তাওয়াফের সময় পুরুষের চাদর ডান বগলের নিচ দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের উপর রাখতে হয়। একে ইজতিবা বলে। তাওয়াফের প্রতি চক্করে রুকনে ইয়ামিনি স্পর্শ করা মুস্তাহাব। তাওয়াফ শেষে যমযম কূপের পানি পান করা মুস্তাহাব। বায়তুল্লাহমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে বিসমিল্লাহ বলে পানি পান করা ও শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা উত্তম।

মাকামে ইবরাহিমে সালাত আদায়

রাসুলুল্লাহ (সা.) কাবা শরিফে সাত চক্কর তাওয়াফ শেষ করে মাকামে ইবরাহিমের পিছনে দু'রাকাআত সালাত আদায় করেছেন। (বুখারি) তাওয়াফ নফল হলেও দু রাকাআত সালাত আদায় করা ওয়াজিব। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন 'তাওয়াফকারী যেন প্রতি সাত চক্করের পর দু'রাকাআত নামায আদায় করে।' (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা) মাকামে ইবরাহিমের যত নিকটবর্তী স্থানে সালাত আদায় করা যায়, ততই ভালো। ভিড়ের কারণে সম্ভব না হলে, হারাম শরিফের যে কোনো স্থানে নামায আদায় করা যায়। মাকামে ইবরাহিমে সালাত আদায় করে দোয়া করা উত্তম।

সাঈ

সাঈ অর্থ দৌড়াদৌড়ি করা, দ্রুত চলা, পথ অতিক্রম করা। তাওয়াফে বিদা আদায় করে সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করতে হয়। সাফা পাহাড় থেকে সাঈ শুরু করে মারওয়া পাহাড়ে সাঈ শেষ করতে হয়। যখন সাফা পাহাড়ের দিকে যাওয়ার সময় বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করে আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলবে আর রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর ওপর দরুদপাঠ করবে ও উভয় হাত উপরে উঠিয়ে দোয়া করবে। বাতনুল ওয়াদি, যা বর্তমানে সবুজ রং দ্বারা চিহ্নিত করা আছে, সেখানে দৌড়াতে হবে। ভিড়ের কারণে দৌড়ানো সম্ভব না হলে দ্রুত হাঁটতে হবে। তবে নারীরা স্বাভাবিকভাবে হেঁটে পথ অতিক্রম করবে। সাঈ করা ওয়াজিব।

নফল তাওয়াফ

এ সময় যতবার ইচ্ছা নফল তাওয়াফ করা যায়। কিন্তু ইসলামি শরিয়তে নফল সাঈ করার বিধান নেই। প্রতিবার নফল তাওয়াফ করে, মাকামে ইবরাহিমে দুই রাকাআত সালাত আদায় করতে হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) নফল তাওয়াফের ফযিলত সম্পর্কে বলেন, 'তাওয়াফের প্রতি কদমে আল্লাহ তা'আলা তাওয়াফকারীর একটি গুনাহ মাফ করেন, একটি সাওয়াব লেখেন এবং দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন'। (মুসনাদে আহমদ)

৭ই যিলহজ

যিলহজ মাসের সাত তারিখ যোহরের সালাতের পর হাজীগণের করণীয় সম্পর্কে ইমাম খুতবা দেন। হাজীদের উচিৎ তা যথাযথ ভাবে শুনে সে অনুযায়ী আমল করা।

৮ই যিলহজ

যিলহজের আট তারিখ সূর্যোদয়ের পর যোহর সালাতের আগে হাজীগণ মিনায় যাবেন। তবে যারা হজে তামাত্তু আদায় করবে, অর্থাৎ প্রথমে ওমরাহ আদায় করে ইহরাম খুলে ফেলেছে তারা এ দিন ইহরাম বাঁধবে। সুন্নাত অনুযায়ী গোসল করে ইহরামের চাদর পরিধান করে বায়তুল্লায় আসবে ও সেখানে ইহরাম বাঁধবে। তাদের জন্য

মসজিদুল হারামে ইহরাম বাঁধা মুস্তাহাব। তবে হারাম শরিফের অভ্যন্তরে যে কোনো জায়গা থেকে ইহরাম বাঁধা জায়েয আছে। মিনায় যাওয়ার সময় তালবিয়া পাঠ করতে থাকবে। সেখানে আট তারিখ যোহর থেকে নয় তারিখ ফজর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা সুন্নাত।

৯ই যিলহজ

৯ই যিলহজ ফজরের নামায আদায় করে সূর্যোদয়ের পর আরাফার ময়দানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে ও সেখানে অবস্থান করবে। কেউ যদি মিনায় না যেয়ে থাকে, তাহলে সে সরাসরি আরাফা অভিমুখে রওনা হবে। তবে রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর সুন্নাত অনুসরণ না করার কারণে তার কাজটি মন্দ কাজ হিসেবে পরিগণিত হবে। আরাফার মাঠে অন্য লোকদের সাথে অবস্থান করবে। আলাদা অবস্থান করবে না, কেননা তা অহংকার প্রকাশ করে। আর জামাতের সাথে দোয়া কবুলের সম্ভাবনা বেশি থাকে। সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়লে, ইমাম লোকদের নিয়ে এক আজান ও দুই ইকামতে যোহর ও আসরের সালাত যোহরের ওয়াক্তে একসাথে আদায় করবেন। আর যোহর ও আসরের মাঝে কোনো নফল সালাত আদায় করা মাকরুহ। তাই নফল সালাত আদায় করা যাবে না। সালাত আদায়ের পূর্বে ইমাম খুতবা পাঠ করবেন। খুতবায় তিনি হজের বিধিনিষেধ বর্ণনা করবেন ও মুসলিম উম্মাহর সমস্যা ও সমাধান নিয়ে আলোচনা করবেন। মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির ওপর গুরুত্বারোপ করে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দিবেন। এরপর সবাইকে সাথে নিয়ে ইমাম দোয়া করবেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) আরাফার ময়দানে দু'হাত প্রসারিত করে দোয়া করতেন। আরাফার ময়দানে অবস্থান হজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয কাজ। যে আরাফার ময়দানে ইহরাম বেঁধে অবস্থান করলো, সে হজ পেলো। যদি কোনো কারণে নয় তারিখ যোহরের সময় আরাফায় উপস্থিত হতে না পারে তাহলে নয় তারিখ দিবাগত রাতে বা সুবহে সাদিকের পূর্বে কোনো সময় কিছুক্ষণের জন্য হলেও আরাফার ময়দানে অবস্থান করলে হজ আদায় হবে। নতুবা হজ বাতিল হয়ে যাবে। আরাফার ময়দানে অবস্থানের সময় যথাসম্ভব জাবালে রহমতের নিকট কিবলামুখী হয়ে অবস্থান করবে। আর বাতনে উরানা থেকে দূরে থাকবে। কেননা রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আরাফার সব স্থানই অবস্থানস্থল। তবে বাতনে উরানা থেকে তোমরা উঠে যাও।' (মুয়াত্তা মালেক)

সূর্যাস্তের পর হাজীগণ মুযদালিফায় ফিরে আসবে ও রাত অতিবাহিত করবে। যদি সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফার সীমানা ত্যাগ করে, তাহলে তার ওপর দম ওয়াজিব হবে। তবে ভিড় এড়ানোর জন্য সূর্যাস্তের পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে অসুবিধা নেই। মুযদালিফায় পৌঁছে ইমাম এক আজানে এক ইকামতে মাগরিব ও এশা একত্রে আদায় করবেন। তখনও দুই সালাতের মাঝে নফল আদায় করা যাবে না। কেউ আরাফায় মাগরিব আদায় করলে, সুবহে সাদিকের পূর্বে পুনরায় মাগরিব আদায় করে নিবে। ওয়াদিয়ে মুহাসসার ব্যতীত মুযদালিফার যে কোনো জায়গায় অবস্থান করতে পারবে।

১০ই যিলহজ

মুযদালিফায় রাত কাটিয়ে ফজরের ওয়াক্তের প্রথম সময়ে অন্ধকার থাকতেই ফজরের সালাত আদায় করতে হয়। তারপর ইমাম সবাইকে নিয়ে দোয়া করবেন। চারদিকে ফর্সা হয়ে গেলে সূর্যোদয়ের পূর্বেই মিনার উদ্দেশ্যে

রওনা হতে হয়। সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বে কিছুক্ষণ মুযদালিফায় অবস্থান করা ওয়াজিব। সমগ্র মুযদালিফায় যে কোনো স্থানে অবস্থান করা জায়েয ওয়াদিয়ে মুহাসসার নামক স্থান ব্যতীত। মিনায় শয়তানের প্রতিকৃতি হিসাবে তিনটি স্তম্ভ আছে। মিনায় পৌঁছে এ দিন শুধু জামরাতুল আকাবা বা বড় শয়তানকে উদ্দেশ্য করে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করতে হয়। মুযদালিফা থেকে জামরাতে পাথর নিক্ষেপের জন্য ৭০টি পাথর কুড়িয়ে আনা মুস্তাহাব। পাথরগুলো ছোলা পরিমাণ বড় হতে হয়, যাতে অন্যকে আঘাত না করে। পাথর নিক্ষেপের পর কুরবানি করবে। যারা শুধু হজ করবেন, তাদের জন্য কুরবানি করা মুস্তাহাব। যারা হজ ও ওমরাহ আদায় করবেন তাদের জন্য শুকরিয়াস্বরূপ কুরবানি ওয়াজিব। কুরবানি করার পর মাথা মুণ্ডন করে ইহরাম খুলে ফেলতে হয়। মাথা মুণ্ডন করা উত্তম। তবে মাথা মুণ্ডন না করে শুধু চুল কাটলেও হবে। চুল কাটার নিয়ম হলো অগ্রভাগ থেকে এক আঙ্গুল পরিমাণ চুল কাটবে। মেয়েদের চুলের অগ্রভাগ থেকে কিছুটা কাটতে হয়। তখন থেকে স্বাভাবিক পোশাক পরিধান করতে পারবে ও অন্যসব কিছু করতে পারবে। তবে সম্পূর্ণ হালাল হবে না।

তারপর যিলহজের ১০, ১১, ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে যে কোনো একদিন বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে হয়। এটি তাওয়াফে যিয়ারত নামে পরিচিত। তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করা ফরয। ১২ তারিখ সুর্যাস্তের পর তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করা মাকরুহ। কেউ বিলম্বে তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করলে, তার ওপর দম ওয়াজিব হবে। তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করে, মিনায় ফিরে ১১ ও ১২ তারিখ অবস্থান করবে। এ দিনগুলোতে মিনায় অবস্থান না করা মাকরুহ।

১১ ও ১২ যিলহজ প্রতিদিন দুপুরের পর মিনার প্রতিটি স্তম্ভে ৭ টি করে মোট ২১টি পাথর নিক্ষেপ করবে। পাথর নিক্ষেপের সময় যেখানে সবাই দাঁড়ায়, সেখানে দাঁড়িয়ে আল্লাহ আকবার ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বে আর রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর ওপর দরুদপাঠ করবে ও দোয়া করবে। ১১ যিলহজ মিনার মসজিদুল খায়েফে যোহরের সালাতের পর ইমাম খুতবা দিবেন, সবার খুতবা শোনা উচিত। কেউ ১২ তারিখ পাথর নিক্ষেপ করে মক্কায় ফিরতে চাইলে, মক্কায় ফিরে আসবে। মিনায় থেকে গেলে ১৩ তারিখ দুপুরের পর আবার তিনটি প্রতিটি স্তম্ভে ৭টি করে ২১টি পাথর নিক্ষেপ করবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) ১৩ তারিখ মিনায় অবস্থান করেছিলেন। মিনা থেকে মক্কায় ফেরার সময় আবতাহ নামক স্থানে অবতরণ করা সুন্নাত। রাসুলুল্লাহ (সা.) এখানে অবতরণ করেছিলেন।

তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ি তাওয়াফ

বহিরাগত হজ পালনকারী অর্থাৎ যারা মক্কার বাইরে থেকে হজ আদায় করতে আসেন তাদের জন্য দেশে ফিরে যাওয়ার আগে তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ি তাওয়াফ আদায় করা ওয়াজিব। এর মাধ্যমে হজের কার্যাবলি আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়। তবে যিলহজ মাসের ১২ তারিখের পর যে কোনো নফল তাওয়াফই বিদায়ি তাওয়াফ হিসেবে আদায় হয়ে যায়। বিদায়ি তাওয়াফ করার পরে কেউ মক্কায় অবস্থান করলে মক্কা থেকে ফিরে যাওয়ার সময় পুনরায় তাওয়াফ করা মুস্তাহাব।

বাড়ির কাজ হজের ধর্মীয়, সামাজিক তাৎপর্য/শিক্ষার একটি তালিকা তৈরি করো। এক্ষেত্রে তুমি তোমার পরিবারের সদস্য, ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সহায়তা নিতে পারো।	
হজের ধর্মীয় তাৎপর্য	হজের সামাজিক তাৎপর্য
গুনাহ মাফ	মুসলমানদের মাঝে পারস্পরিক সৌহার্দ্য

হজের কার্যাবলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য

হজ আদায়ের সময় আমরা পবিত্র কাবাঘরসহ আল্লাহর নিদর্শনাবলি প্রত্যক্ষ করতে পারি। ফলে আমাদের তাকওয়া বৃদ্ধি পায়। এছাড়া হজের প্রত্যেকটি কাজের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আছে। চলো সে বিষয়ে জেনে নেই।

ইহরাম বাঁধা

ইহরাম অবস্থায় বান্দা নিজেকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে। সবকিছু থেকেও ফকির মিসকিনের মতো সেলাইবিহীন দুটি চাদর পরিধান করে কাবা শরিফে উপস্থিত হয়। সবকিছু থাকলেও সে এই কাপড় ব্যতীত আর কিছুই পরিধান করতে পারে না। ফলে হাজী মৃত্যুর চিন্তা করে। মানুষ মৃত্যুর সময়ও এভাবে সব রেখে দুনিয়া থেকে চলে যাবে। এছাড়া আল্লাহ তা'আলার হুকুমের কারণে হাজী ইহরাম অবস্থায় অনেক বৈধ বিষয় থেকেও দূরে থাকে, যা তাকে হজ আদায় শেষে অবৈধ বিষয় থেকেও দূরে থাকতে সাহায্য করে। ইহরাম মানুষকে তাওবা করতে অনুপ্রাণিত করে। সে উপলব্ধি করে, পশুপাখিও আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত হেরেমে প্রবেশ করলে নিরাপদ থাকে। আমরা যদি আল্লাহর রহমতের দিকে ফিরে যাই, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের মাফ করবেন।

সাঈ করা

হযরত হাজেরা (আ.) পানির জন্য সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন। তাই আমরা হযরত হাজেরা (আ.)- এর স্মরণে সাঈ করি। আল্লাহ তা'আলা সাফা ও মারওয়া সম্পর্কে বলেন–

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ

অর্থ: 'নিশ্চয়ই 'সাফা' এবং 'মারওয়া' আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৫৮)

হাজরে আসওয়াদে চুম্বন

হাজরে আসওয়াদ জান্নাতি পাথর। এটি চুম্বনের মাধ্যমে মানুষের গুনাহ মাফ হয়। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর পরিপূর্ণ আনুগত্য। তাইতো হযরত ওমর (রা.) একদিন হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করার সময় বলেছিলেন, 'আমি অবশ্যই জানি যে, তুমি একটি পাথর মাত্র। তুমি কারো কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পারো না। আমি মহানবি (সা.)-কে যদি তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে কখনোই চুম্বন করতাম না।' (বুখারি ও মুসলিম)

মাকামে ইবরাহিমে সালাত আদায়

আল্লাহর নবি হযরত ইবরাহিম (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা বার বার পরীক্ষা করেছেন। প্রতিবারই তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাই আল্লাহ ইবরাহিম (আ.)- এর আদর্শ গ্রহণের উৎসাহ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য হযরত ইবরাহিম (আ.) ও তাঁর সাথীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।' (সূরা মুমতাহিনা, আয়াত: ৪) হযরত ইবরাহিম (আ.) কাবা শরিফ নির্মাণের পর আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করেন। তাই তাঁর স্মরণে আমাদেরকেও সেখানে সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মাকামে ইবরাহিমে সালাত আদায় প্রসঙ্গে বলেন–

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ

অর্থ: 'তোমরা মাকামে ইবরাহিমকে সালাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করো।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১২৫) আমরা মাকামে ইবরাহিমে ইখলাসের সাথে দোয়া করবো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমাদের দোয়া কবুল করবেন।

আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থান

আরাফা ও মুযদালিফায় মুমিন ব্যক্তি যখন লাখ লাখ মুমিনের সাথে একত্রিত হয়, তখন তার মাঝে প্রকৃত ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়। সেখানে সবাই সমান। সবাই একই পোশাকে তালবিয়া পাঠ করতে থাকে। খোলা মাঠে এভাবে রাত কাটানোর মাধ্যমে হাজীগণের মনে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের প্রতি সহানুভূতি জাগ্রত হয়।

শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ

আল্লাহ তা'আলার আদেশে ইবরাহিম (আ.) যখন ঈসমাইল (আ)-কে কুরবানি করতে মিনায় নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন শয়তান, হযরত ইবরাহিম (আ), হযরত হাজেরা (আ.) ও হযরত ঈসমাইল (আ.)-কে কুমন্ত্রণা দিতে যায়। কিন্তু প্রত্যেকে শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করে তাড়িয়ে দেন। তাদের স্মরণেই আমরা প্রতীকীভাবে শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করি। পাথর নিক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য হলো আমরা যাতে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শয়তানের প্ররোচনা থেকে বেঁচে থাকতে পারি।

হজের নিষিদ্ধ কার্যাবলি

ইহরাম বাঁধার পর হাজী আল্লাহ তা'আলার নিকট নিজেকে সমর্পণ করে। তখন তার ওপর কিছু হালাল কাজও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। যেমন সালাত আদায় করার সময় তাকবিরে তাহরিমা বলে সালাত শুরু করলে, সালাত শেষ করা পর্যন্ত অন্য সকল কাজ হারাম হয়ে যায়। তেমনি ইহরাম বাঁধার পর, হজ শেষে ইহরাম খুলে ফেলার আগ পর্যন্ত কিছু কাজ করা তার জন্য হারাম হয়ে যায়। সেগুলো নিম্নরূপ:

১. অশ্লীল কথা বলা বা অশ্লীল কাজ করা।

২. ইসলামি শরিয়ত মোতাবেক সকল নিষিদ্ধ কাজ বা পাপাচার, সেগুলো এমনিতেই নিষিদ্ধ। ইহরাম বাঁধা অবস্থায় সে কাজগুলো করা আরো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

৩. কারো সাথে ঝগড়া-বিবাদ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ؕ

অর্থ: '(যে ব্যক্তি হজ করার ইচ্ছা করে) তার জন্য অশ্লীল কাজ, পাপাচার ও ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়া নিষিদ্ধ।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৯৭)

৪. কোনো প্রাণি শিকার করা বা অন্যকে শিকার করার জন্য শিকার দেখিয়ে দেওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ

অর্থ: 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকার-জন্তু হত্যা করো না।' (সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৯৫)

৫. পুরুষের জন্য সেলাই করা কাপড় পরা নিষিদ্ধ। তাই পাঞ্জাবি, পায়জামা, মোজা পরা নিষিদ্ধ। তবে কোমরে টাকার ব্যাগ বেঁধে রাখতে অসুবিধা নেই। আর মহিলারা সেলাই করা কাপড়ই পরবে।

৬. পুরুষের জন্য মাথা ও মুখ আবৃত করা নিষিদ্ধ। তাই পাগড়ি ও টুপি পরা নিষিদ্ধ। তবে মহিলারা মাথা ঢেকে রাখবে ও মুখ খোলা রাখবে।
৭. আতর বা সুগন্ধি ব্যবহার করা বা আতর সুগন্ধি মিশ্রিত পোশাক পরা। সুগন্ধি সাবানও ব্যবহার করা যাবে না।
৮. তেল ব্যবহার করা।
৯. নখ কাটা, মাথার চুল কাটা বা দাড়ি ছাঁটা। এমনকি পশমও কাটা বা উপড়ানো যাবে না। তবে অনিচ্ছাকৃত কোনো কাজ যেমন, গোসলের সময় বা মাথা চুলকানোর সময় চুল পড়লে কোনো অসুবিধা নেই। তবে হাজীর ইহরাম অবস্থায় চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ানো অনুচিত।

হজের ত্রুটি ও তা সংশোধনের উপায়

হজ পালনকালে অনিচ্ছাকৃত অনেক ভুলত্রুটি বা নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে যেতে পারে। ইসলামি পরিভাষায় একে জিনায়াত বলে। এসব ত্রুটিবিচ্যুতির মধ্যে কিছু বিষয় আছে অনেক বড়, আবার কিছু বিষয় আছে ছোট। আবার কিছু বিষয় আছে যা একেবারে সাধারণ পর্যায়ের; যার কোনো প্রতিকারের প্রয়োজন নেই।

হজের সময় অনিচ্ছায় ঘটে যাওয়া ত্রুটি বা বিষয়গুলোর গুরুত্ব ও লঘুত্ব বিবেচনা করে কয়েকটি বিধান রয়েছে। আর তা হলো: দম, বুদনা ও সাদকা। দম একটি ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা জবেহ করা। গরু, মহিষ বা উট হলে তার ৭ ভাগের এক ভাগ দেওয়া।

যদি কেউ হজ বা ওমরার ওয়াজিব আদায়ে ভুল করে ফেলে অথবা ইহরামের নিষিদ্ধ কোনো কাজ করে ফেলে তবে তাকে দম দিতে হবে। আবার অনেক সময় একাধিক দমও দিতে হয়। কারণ ইহরাম অবস্থায় কিরান হজ পালনকারী হাজী তার ত্রুটির জন্য হজ ও ওমরা উভয়টির নিয়তের কারণে ওমরার আগেই ২টি দম দিতে হয়। কেননা কিরান হজ পালনকারী ব্যক্তি এক ইহরামেই হজ ও ওমরা পালন করেন।

অভিনয়

শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক তুমি/তোমরা হজের বিভিন্ন কার্যাবলি অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করো।